সূচিপত্র

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

৮ম বর্ষ ০৮ম সংখ্যা

নভেম্বর-২০২৫

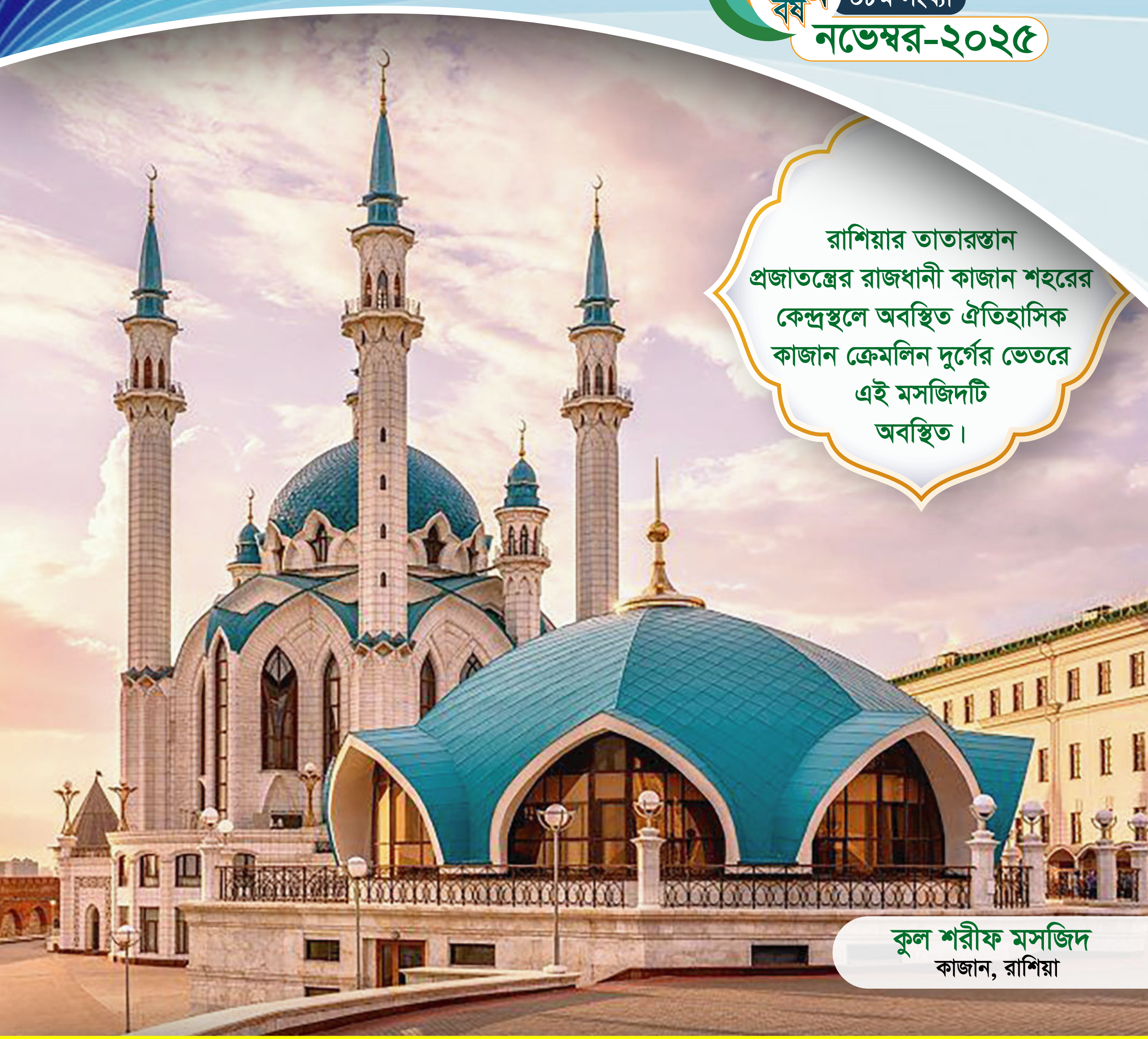

রাশিয়ার তাতারস্তান প্রজাতন্ত্রের রাজধানী কাজান শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ঐতিহাসিক কাজান ক্রেমলিন দুর্গের ভেতরে এই মসজিদটি অবস্থিত।

কুল শরীফ মসজিদ
কাজান, রাশিয়া

সূচিপত্র

মাসিক
তর্জুমানুল হাদীস

রেজি নং ডি.এ.১৪২

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র
مجلة البحوث العلمية النطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কেরায়শী (রহিমাহুল্লাহ)

সম্পাদক মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহিমাহুল্লাহ)

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত নভেম্বর ২০২৫ মাসের সালাতের সময়সূচী (ঢাকার জন্য)

তারিখ	ফজর	যোহর	‘আসর	মাগরিব	‘ইশা	তারিখ	ফজর	যোহর	‘আসর	মাগরিব	‘ইশা
০১.১১.২৫	০৪:৪৮	১১:৪২	০২:৫৬	০৫:২০	০৬:৩৬	১৬.১১.২৫	০৪:৫৬	১১:৪৪	০২:৫১	০৫:১৩	০৬:৩১
০২.১১.২৫	০৪:৪৯	১১:৪২	০২:৫৫	০৫:১৯	০৬:৩৬	১৭.১১.২৫	০৪:৫৭	১১:৪৪	০২:৫১	০৫:১৩	০৬:৩১
০৩.১১.২৫	০৪:৪৯	১১:৪২	০২:৫৫	০৫:১৯	০৬:৩৫	১৮.১১.২৫	০৪:৫৭	১১:৪৪	০২:৫১	০৫:১২	০৬:৩১
০৪.১১.২৫	০৪:৫০	১১:৪২	০২:৫৪	০৫:১৮	০৬:৩৫	১৯.১১.২৫	০৪:৫৮	১১:৪৪	০২:৫১	০৫:১২	০৬:৩১
০৫.১১.২৫	০৪:৫০	১১:৪২	০২:৫৪	০৫:১৭	০৬:৩৪	২০.১১.২৫	০৪:৫৮	১১:৪৪	০২:৫০	০৫:১২	০৬:৩১
০৬.১১.২৫	০৪:৫১	১১:৪২	০২:৫৪	০৫:১৭	০৬:৩৪	২১.১১.২৫	০৪:৫৯	১১:৪৫	০২:৫০	০৫:১২	০৬:৩১
০৭.১১.২৫	০৪:৫১	১১:৪২	০২:৫৩	০৫:১৬	০৬:৩৪	২২.১১.২৫	০৪:৫৯	১১:৪৫	০২:৫০	০৫:১২	০৬:৩০
০৮.১১.২৫	০৪:৫২	১১:৪৩	০২:৫৩	০৫:১৬	০৬:৩৩	২৩.১১.২৫	০৫:০০	১১:৪৫	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩০
০৯.১১.২৫	০৪:৫২	১১:৪৩	০২:৫৩	০৫:১৬	০৬:৩৩	২৪.১১.২৫	০৫:০১	১১:৪৬	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩০
১০.১১.২৫	০৪:৫৩	১১:৪৩	০২:৫২	০৫:১৫	০৬:৩৩	২৫.১১.২৫	০৫:০১	১১:৪৬	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩০
১১.১১.২৫	০৪:৫৩	১১:৪৩	০২:৫২	০৫:১৫	০৬:৩২	২৬.১১.২৫	০৫:০২	১১:৪৬	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩০
১২.১১.২৫	০৪:৫৪	১১:৪৩	০২:৫২	০৫:১৪	০৬:৩২	২৭.১১.২৫	০৫:০২	১১:৪৬	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩১
১৩.১১.২৫	০৪:৫৪	১১:৪৩	০২:৫২	০৫:১৪	০৬:৩২	২৮.১১.২৫	০৫:০৩	১১:৪৭	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩১
১৪.১১.২৫	০৪:৫৫	১১:৪৩	০২:৫১	০৫:১৪	০৬:৩২	২৯.১১.২৫	০৫:০৪	১১:৪৭	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩১
১৫.১১.২৫	০৪:৫৬	১১:৪৩	০২:৫১	০৫:১৩	০৬:৩১	৩০.১১.২৫	০৫:০৪	১১:৪৮	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩১

ঢাকার সময়ের আগে	সময়	ঢাকার সময়ের পরে
নারায়নগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সীগঞ্জ, পিরোজপুর	১ মিনিট	গাজীপুর, খুলনা, গোপালগঞ্জ
চাঁদপুর, বরিশাল, বি.বাড়িয়া	২ মিনিট	ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ
সিলেট, হবিগঞ্জ	৩ মিনিট	টাংগাইল, সাতক্ষীরা
কুমিল্লা, মৌলভী বাজার	৪ মিনিট	যশোর, সিরাজগঞ্জ, রাজবাড়ী, শেরপুর, জামালপুর, ঝিনাইদহ
নোয়াখালী	৫ মিনিট	পাবনা, কুষ্টিয়া
ফেনী	৬ মিনিট	বগুড়া * ১০ মিনিট পরে : চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সৈয়দপুর
	৭ মিনিট	গাইবান্ধা, নাটোর, মেহেরপুর, কুড়িগ্রাম
	৮ মিনিট	নওগাঁ, রাজশাহী * ১৩ মিনিট পরে : ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়
চট্টগ্রাম	৯ মিনিট	জয়পুরহাট, রংপুর, লালমনিরহাট
কক্সবাজার	১১ মিনিট	দিনাজপুর, নীলফামারী

সূর্যাস্তের সময় অনুসারে ঢাকার সময়ের সাথে কিশোরগঞ্জ ও বাগেরহাট

সূচিপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক
مجلة ترجمان الحديث الشهرية
তর্জুমানুল হাদীস
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র
مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش

রেজি নং ডি.এ.১৪২

৩য় পর্ব

৮ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা

নভেম্বর ২০২৫ ঈসায়ী

জমাঃ আউঃ-জমাঃ সানি ১৪৪৭ হিজরী

কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪৩২ বাংলা

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
শাইখ মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহকারী সম্পাদক
শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ মাদানী

প্রবাস সম্পাদক
শাইখ মুহাম্মাদ আজমাল হুসাইন মাদানী

ব্যবস্থাপক
চৌধুরী মুমিনুল ইসলাম

সহকারী ব্যবস্থাপক
মো: রমযান ভূঁইয়া

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ.কে.এম শামসুল আলম
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. মো: লোকমান হোসেন
শাইখ সাইফুদ্দীন বেলাল মাদানী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
প্রফেসর ড. মো: মতিউর রহমান
মো: জামাল হোসেন
ড. মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ
শাইখ আব্দুর রউফ মাদানী
শাইখ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী
শাইখ ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী

যোগাযোগ :
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪
ফোন : +৮৮০২-২২৪৪৫৮৫৫১
ব্যবস্থাপক : ০১৯১৬-৭০০৮৬৬
মোবাইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮ (অফিস)

সার্কুলেশন বিভাগ
বিকাশ: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮

ই-মেইল : tarjumanulhadeethbd@gmail.com
www.jamiyat.org.bd
https://www.facebook.com/tarjumanulhadeeth

মূল্য : ২৫/- [পঁচিশ টাকা মাত্র]

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

মাসিক

তর্জুমানুল হাদীস

রেজি নং ডি.এ.১৪২

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র

مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

تصدر من مكتب جمعية أهل الحديث ببنغلاديش، ٩٨ شارع نواب فور، داكا- ١١٠٠

الهاتف : ٨٨٠٢-٢٢٤٤٥٨٥٥١+ الجوال : ٠١٧٦١٨٩٧٠٧٦

المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافى القريشي (رحمه الله تعالى)،

المشرف العام للمجلة: الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق السلفي،

رئيس التحرير: أ/محمد هارون حسين.

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জেলা জমঈয়তের সুপারিশপত্রসহ প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোনো সময় এজেন্সি নেয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০% ও ২৬-১০০ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য দেয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস" সঞ্চয়ী হিসাব নং-২৮৫৬, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, নবাবপুর শাখা, ঢাকায় (অন-লাইনে) জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক চাঁদার হার	ষান্মাষিক চাঁদার হার
বাংলাদেশ	৩৬০/-	১৮০/-
পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও মায়ানমার	২০ ইউ.এস. ডলার	১০ ইউ.এস. ডলার
সাউদী আরব, ইরাক, ইরান, কুয়েতসহ মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহ ও সিঙ্গাপুর	২৫ ইউ.এস. ডলার	১২ ইউ.এস. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রুনাইসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহ	২২ইউ.এস. ডলার	১১উ.এস. ডলার
আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডসহ পশ্চিমা দেশসমূহ	৩৫ ইউ.এস. ডলার	১৮ ইউ.এস. ডলার

বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০,০০০/-
শেষ প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	২৫০০/-
সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা	১২০০/-

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

❖ শিক্ষক ও শিক্ষার মর্যাদা।.. ৩

দারসুল কুরআন

❖ বরকত লাভের জন্য করণীয় ।.. ৪

শাইখ মুফাযযল হুসাইন মাদানী

দারসুল হাদীস

❖ কর্মের ফল সর্বশেষ কর্মের উপর নির্ভরশীল........................৭

শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা

প্রবন্ধ :

❖ রাজকীয় মেহমান হিসেবে হজ্জ পালন: অনুপম অনুভূতির লেখচিত্র....১০

আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী

❖ কুরআনবাদের স্বরূপ সন্ধান ও সংশয় নিরসন।........................১৩

শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক্ব

❖ দাঈর অপরিহার্য গুণাবলি..১৭

আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল মাদানী

❖ তাহাজ্জুদ : আল্লাহ যখন প্রথম আসমানে।........................১৯

তরিকুল ইসলাম মাদানী

❖ দু'আ : হৃদয়ের সংলাপ, রবের জবাব।...........................২২

আবু মাহদী মামুন আব্দুল্লাহ

❖ ঈমানী চেতনা।...২৬

আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন

শুব্বান পাতা

❖ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগের অপরিহার্যতা....৩০

মোহাম্মদ মাযহারুল ইসলাম

❖ শৈশবের ভারী ব্যাগ।... ৩৫

আব্দুল্লাহ আল নুমান

❖ বন্ধুত্ব।...৩৮

সাব্বির আহমেদ বিন সাইফুল ইসলাম

❖ "জ্ঞান : ধনের উর্ধ্বে অমর মহিমা"। ৪৩

মোঃ সুলাইমান বিন হাবিবুল্লাহ

❖ ফাতাওয়া ও মাসায়েল।..৪৬

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস নভেম্বর ২০২৫ ঈ:/ জমাঃ আউঃ-জমাঃ-সানি ১৪৪৭ হিঃ مجلة ترجمان الحديث الشهرية

সম্পাদকীয় الافتتاحية

শিক্ষক ও শিক্ষার মর্যাদা

ইসলাম সু-শিক্ষার প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। মহানবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি প্রথম ওহীর নির্দেশ ছিলো-'ইকরা'। মহান আল্লাহ কুরআনুল কারীম-এ জ্ঞানীদের উচু মর্যাদার কথা বলেছেন। যে জ্ঞান সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্ধারণ করে, তাই প্রকৃত শিক্ষা। সে কারণে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও দীন শিক্ষা হতে বিমূখকারী কোনো শিক্ষাকে প্রকৃত শিক্ষা বলা যায় না। আর আমাদের সমাজে দিন দিন প্রচলিত শিক্ষার প্রসারের সাথে সাথে নৈতিকতাও বিদায় নিচ্ছে। এটি জাতির জন্য বড়ো কলঙ্কের। আজ নীতি বাণী বা বাক্য নিভৃতে কাঁদে। আমাদের এ দেশেও অপসংস্কৃতির প্রভাব লক্ষণীয়। ছাত্রকে আদব শিক্ষা দেওয়া দুষ্কর হয়ে পড়েছে। শাসন তো দূরের কথা, নসীহ্ত করতে গেলেও অনেকে বিরক্ত হয়। এমনকি শিক্ষকের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে কিংবা অপমান-অপদস্ত করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। ফলে শিক্ষকের মর্যাদা বিঘ্নিত হওয়া শিক্ষকতার ন্যায় মহান পেশায় আজ ভদ্র পরিবারের যোগ্য ব্যক্তিগত নিরুৎসাহ বোধ করবেন। এরূপ হতে থাকলে মানুষ গড়ার কারিগর পুঁথিতে থাকবে; বাস্তবতায় থাকবে না। ফলে জাতি মহা সংকটে পড়বে। অজ্ঞতা সমাজে ঝেঁকে বসবে। তাই বিভীষিকা দেখার আগে জাতিকে সজাগ হতে হবে।

শিক্ষক সমাজের আলোকবর্তিকা। তিনি অন্ধকার থেকে আলোয়, অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানে মানবজাতিকে পথ দেখান। শিক্ষা হলো জাতির মেরুদণ্ড, আর সেই মেরুদণ্ডকে দৃঢ় করে রাখেন শিক্ষক। একজন প্রকৃত শিক্ষক কেবল পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান দেন না, তিনি নৈতিকতা, মানবতা ও মূল্যবোধের আলো ছড়িয়ে দেন। তাই শিক্ষকের মর্যাদা শুধু একজন কর্মজীবী মানুষের মর্যাদায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং তিনি একটি জাতির আত্মা ও সভ্যতার ধারক।

বর্তমান যুগে প্রযুক্তির অগ্রগতি যেমন আমাদের জীবনকে সহজ করেছে, তেমনি শিক্ষাক্ষেত্রেও এনেছে এক নতুন দিগন্ত। কিন্তু দুঃখজনকভাবে দেখা যায়, সমাজে শিক্ষকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদা আগের তুলনায় কমে এসেছে। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকরা অবমূল্যায়নের শিকার হচ্ছেন, যা শিক্ষার গুণগত মানের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। অথচ, কোনো জাতি তার শিক্ষককে যথাযথ সম্মান না দিলে সেই জাতি কখনো অগ্রসর হতে পারে না।

শিক্ষার মূল লক্ষ্য কেবল চাকরি পাওয়া নয়, বরং মানুষ হওয়া। একজন আদর্শ শিক্ষক সেই মানুষ গড়ার কারিগর। তাঁর হাত ধরে তৈরি হয় বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, প্রশাসক, চিকিৎসক-সমাজের প্রতিটি স্তম্ভ। তাই শিক্ষকের মর্যাদা রক্ষা করা মানে শিক্ষা ও মানবতার মর্যাদা রক্ষা করা।

রাষ্ট্রের উচিত শিক্ষকদের প্রাপ্য সম্মান, ন্যায্য বেতন ও প্রশিক্ষণের সুযোগ নিশ্চিত করা, যেন তাঁরা নিষ্ঠা ও আত্মমর্যাদার সঙ্গে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গড়ে তুলতে পারেন। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদেরও শেখা উচিত শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা-যা আমাদের সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

অতএব, শিক্ষক ও শিক্ষার মর্যাদা রক্ষা কেবল একটি কর্তব্য নয়, এটি জাতি গঠনের প্রথম শর্ত। একমাত্র সম্মানিত শিক্ষক ও মর্যাদাপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমেই আমরা আলোকিত, ন্যায়ভিত্তিক ও মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারব।

আসুন! আমরা কল্যাণমূখী প্রকৃত শিক্ষার প্রতি যত্নশীল হই! নিজ সন্তানকে শিক্ষার গুরুত্ব, প্রয়োজণীয়তা ও শিক্ষকের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন করি। মহান আল্লাহই তাওফীক দাতা!

দারসুল কুরআন/ من دروس القرآن

বরকত লাভের জন্য করণীয়

শাইখ মুফায্‌যল হুসাইন মাদানী*

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

আয়াতের অনুবাদ :

জনপদের অধিবাসীগণ যদি ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের জন্য আসমান ও যমীনের বরকতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম; কিন্তু তারা (নবী-রাসূলদেরকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, ফলে তাদের কৃতকর্মের জন্য আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম।[১]

সংক্ষিপ্ত তাফসীর :

بَرَكَةٌ অথবা اَلْبَرَكَةُ আরবী শব্দ। যা বাংলা ভাষায়ও বরকত বলে ব্যবহৃত এবং প্রচলিত। শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত ও বহুল প্রচলিত হওয়ার কারণে সকলের নিকটে এর অর্থ বিশেষভাবে বোধগম্যও বটে। পক্ষান্তরে আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী রাহিমাহুল্লাহ-এর সংজ্ঞা প্রণয়নে বলেছেন : البركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء অর্থাৎ, কোনো বস্তু বা বিষয়ে আল্লাহ প্রদত্ত কল্যাণ অবধারিত হওয়ার নাম বরকত।[২]

সুতরাং কোনো বস্তুর আধিক্যের চেয়ে অল্পের মাধ্যমে উপকার বেশি হওয়ার নামই হলো বরকত। এ ব্যাপারে আল্লাহর বাণী : وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا অর্থাৎ, জনপদের লোকেরা যদি ঈমান আনত এবং তাকওয়া অর্জন করে সেই অনুযায়ী তারা চলত তাহলে আমি তাদের জন্যে আকাশ ও যমীনের বরকত অবতীর্ণ করতাম। অর্থাৎ আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে যমীনে ফল-মূল ও ফসলাদি উৎপাদনের ব্যবস্থা করে দিতাম। কিন্তু তারা তাদের নিকট প্রেরিত রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করায় এর শাস্তি স্বরূপ আমি তাদেরকে আযাবের স্বাদ গ্রহণ করিয়েছি।[৩]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

একজন মুসলিমের উচিত, তার ইল্‌ম-আমল, সময়-সম্পদ, পরিবার-পরিজন সন্তান-সন্তুতি এবং দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য আল্লাহর নিকট বরকত কামনা করা। আর যেসব উপায়-উপকরণের দ্বারা বরকত লাভ হয়, সেসব উপায়-উপকরণ অর্জনে সচেষ্ট হওয়া।

অতএব, বরকত লাভের জন্য কিছু নিয়ম-নীতি অনুসরণ করা একান্তই প্রয়োজন, যা নিম্নে তুলে ধরা হলো :

১. ঈমান ও তাকওয়া :

বরকত লাভের জন্যে পূর্ণাঙ্গ মু'মিন হতে হবে এবং তাকওয়া অর্জন করতে হবে। যেমনটি স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আলোচ্য আয়াতে বলেছেন এবং বাস্তবতাও তাই সাক্ষ্য প্রদান করে। কেননা আল্লাহর নবী ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার এবং তাকওয়াসম্পন্ন ছিলেন, যার কারণে সবচেয়ে বেশি বরকতপূর্ণ তারাই হয়েছিলেন। সর্ববৃহৎ বরকত যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয়নবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে দিয়েছেন, আর তা হলো, মহাগ্রন্থ "আল কুরআন"। যার পরিপূর্ণ বাস্তবায়নকারী ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾

"এক বরকতময় কিতাব, এটা আমি তোমার ওপর অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং জ্ঞানী ব্যক্তিরা উপদেশ গ্রহণ করে।"[৪]

২. দু'আ :

অর্থাৎ, বরকত লাভের অন্যতম দ্বিতীয় উপায় হলো- বরকতের দু'আ করা। নবী করীম ﷺ আমাদেরকে

---

* ভাইস প্রিন্সিপাল, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, যাত্রাবাড়ী-ঢাকা।

[১] সূরা আ'রাফ আয়াত : ৯৬।

[২] মু'জামুল মুফরাদাতি আলফাযিল কুরআনিল কারীম।

[৩] আল মিসবাহুল মুনীর ফী তাহযীব তাফসীর ইবনু কাসীর, পৃ:- ৪৯২।

[৪] সূরা সোয়াদ আয়াত : ২৯।

বরকত লাভের জন্য দু'আ শিখিয়েছেন এবং তা করতে বলেছেন : যেমন নব-দম্পত্তির জন্য আমরা বলে থাকি :

«بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في الخير»

"আল্লাহ তা'আলা তোমার জীবন বরকতময় করুন আর তোমাদেরকে কল্যাণের মধ্যে একত্রিত করুন।"[৫]

কেউ খাবার খাওয়ালে তার জন্য এই দু'আ করতে বলেছেন :

«اللَّهُمَّ، بَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ»

"হে আল্লাহ তাদেরকে তুমি যে রিযিক দিয়েছ তাতে বরকত দান করো। আর তাদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং তাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করো।"[৬]

প্রত্যেকের নিজের খাবারের মধ্যেও বরকতের জন্য এই দু'আ করতে বলেছেন :

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ، وَإِذَا سُقِيَ لَبَنًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَزِدْنَا مِنْهُ،

"তোমাদের কেউ যখন খাবার খাবে তখন সে যেন বলে : হে আল্লাহ! আমাদেরকে এর মধ্যে বরকত দিন এবং এর চেয়ে উত্তম খাবার দান করুন, এবং দুধ পানের সময় যেন বলে : হে আল্লাহ আমাদেরকে এর মধ্যে বরকত দিন এবং এর চেয়ে আরো বাড়িয়ে দিন।"[৭]

রাসূল ﷺ-এর নিকটে ছোটো বাচ্চাদের নিয়ে আসলে তাদের জন্য বরকতের দু'আ করতেন।[৮] অনুরূপ লোকেরা তাঁর নিকট বাগানে ফলিত নতুন কোনো ফলমূল নিয়ে এলে দু'আ করতেন :

«اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَفِي ثِمَارِنَا، وَفِي مُدِّنَا، وَفِي صَاعِنَا بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ» ، ثُمَّ يُعْطِيهِ أَصْغَرَ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنَ الْوِلْدَانِ.

"হে আল্লাহ! আমাদের শহরে (মদিনায়), আমাদের ফলে (বা উৎপাদিত ফসলে), আমাদের মুদ্দ ও সা'-তে (মাপে ও পরিমাপে) বরকত দান করো, বরকতের ওপর বরকত দান করো। অতঃপর তিনি ফলটি তাঁর নিকট উপস্থিত সবচেয়ে ছোটো শিশুকে দিয়ে দিতেন।"[৯]

৩. মনে সন্তোষভাব পোষণ করা :

অর্থাৎ, ধন-সম্পদ অথবা অন্য কোনো বস্তু প্রাপ্তির সময় পীড়াপীড়ি না করে খুশি মনে তা গ্রহণ করা। এ মর্মে নবী করীম ﷺ হাকীম বিন হিযাম রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে বলেন :

يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ.

"হে হাকীম! এ সম্পদ সবুজ-শ্যামল সুস্বাদু। যে ব্যক্তি প্রশস্ত অন্তরে (লোভ ব্যতীত) তা গ্রহণ করে তার জন্য তা বরকতময় করা হয়। আর যে ব্যক্তি অন্তরের লোভসহ তা গ্রহণ করে তার জন্য তা বরকতময় করা হয় না। যেন সে এমন ব্যক্তির মতো, যে খায় কিন্তু সে পরিতৃপ্ত হয় না।" [১০]

৪. দান-খয়রাত করা :

মাল-ধনে বরকত লাভের জন্য ইখলাস ও খুশি-মনে বেশি বেশি দান-খয়রাত করা। যেমন আল্লাহ বলেছেন :

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

"কে সে, যে আল্লাহকে উত্তমভাবে ঋণদান করে? অনন্তর তিনি তাতে দ্বিগুণ বহুগুণ বর্ধিত করে দেন এবং আল্লাহই (মানুষের আর্থিক অবস্থাকে) সঙ্কুচিত বা স্বচ্ছল করে থাকেন এবং তারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে।"[১১]

হাদীসেও রয়েছে যে, مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ "দান-সাদাকাহ ধন-সম্পদকে কমিয়ে দেয় না।"[১২]

[৫] তিরমিযী হা : ১০৯১।
[৬] সহীহ মুসলিম হা : ২০৪২।
[৭] আবূ দাউদ হা : ৩৭৩০।
[৮] আবূ দাউদ হা : ৫১০৬।
[৯] সহীহ মুসলিম হা : ১৩৭৩।
[১০] সহীহ বুখারী হা : ১৪৭২।
[১১] সূরা আল-বাকারা আয়াত : ২৪৫।
[১২] সহীহ মুসলিম হা : ২৫৮৮।

হাদীসে কুদসীতেও রয়েছে, রাসূল ﷺ বলেছেন :

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ "

“আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন : হে বানী আদম! তুমি (আমার পথে) খরচ করো, আমি তোমার জন্য খরচ করব (অর্থাৎ তোমার সম্পদকে বাড়িয়ে দিব)।”[১৩]

৫. সত্যের ওপর থাকা :

অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়, লেন-দেন ও আদান-প্রদানে সত্যতার ওপর বিদ্যমান থাকা। রাসূল ﷺ বলেন :

«الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا»

“ক্রেতা-বিক্রেতা (একে অপরের সাথে) বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের উভয়ের ইখতিয়ার থাকবে। যদি তারা উভয়ে সত্য কথা বলে ও (অন্যের দোষ-ত্রুটি) যথাযথ বর্ণনা করে তবে তাদের কেনা-বেচায় বরকত হবে। আর যদি মিথ্যা বলে ও (দোষ-ত্রুটি) গোপন করে, তবে তাদের কেনা-বেচার বরকত নষ্ট হয়ে যাবে।”[১৪]

৬. সকাল বেলায় কাজ-কর্ম করা :

অর্থাৎ যে- কোনো কাজ দিনের শুরুভাগে আরম্ভ করা এবং যথাসম্ভব সকাল সকাল কাজ সম্পন্ন করা। এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ দু‘আয় বলেছেন : اللهم بارك لأمتي في بكورها অর্থ, হে আল্লাহ! তুমি আমার উম্মতের সকাল বেলার কাজের মধ্যে বরকত দান করো।[১৫]

৭. পানাহারে সুন্নাতের অনুসরণ করা :

অর্থাৎ রাসূল ﷺ যেভাবে পানাহার করেছেন এবং তার উম্মতকে যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক সেভাবে পানাহার করা। যেমন খাদ্যের মধ্যভাগ থেকে খাওয়া আরম্ভ না করে একপাশ থেকে খাওয়া। অনুরূপ একা না খেয়ে সম্মিলিতভাবে খাবার খাওয়া এবং খাওয়ার পর খাবারের পাত্র ও হাত পরিষ্কার করে খাওয়া। এসব ব্যাপারে রাসূল ﷺ বলেন :

«البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه، ولا تأكلوا من وسطه»

“খাদ্যের মাঝখানে বরকত নাযিল হয়। অতএব তোমরা এর কিনারা হতে খাওয়া আরম্ভ করো, মাঝখান হতে খেয়ো না।”[১৬]

وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ، قَالَ: «فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ»

“পাত্রকে পরিষ্কার করে খেতে আমাদেরকে নির্দেশ করেছেন (খাওয়ার)। আর বলেছেন, খাদ্যের কোন্ অংশে বরকত নিহিত আছে তা তোমরা জানো না।[১৭]

অন্য বর্ণনায় রাসূল ﷺ বলেন : তোমরা (খাওয়ার পর) হাতের আঙুলগুলো চেটে খাবে।”[১৮]

عَنْ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ وَحْشِيٍّ، أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَأْكُلُ، وَلَا نَشْبَعُ، قَالَ: «فَلَعَلَّكُمْ تَأْكُلُونَ مُتَفَرِّقِينَ؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ»

“ওয়াহ্শী ইবনু হারব থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। একদা নবী করীম ﷺ-এর সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা খাবার খাই কিন্তু পরিতৃপ্ত হতে পারি না। তিনি বললেন : হয়ত তোমরা বিচ্ছিন্নভাবে খাও। তারা বললেন : হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমরা একত্রে আহার করো এবং খাদ্য গ্রহণের সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের খাদ্যে বরকত দেওয়া হবে।”[১৯]

সুধী পাঠকবর্গ! মানব জাতির জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে সার্বিক ব্যাপারে বরকতের একান্ত প্রয়োজন। তাই বরকত লাভের উপায়সমূহ অবলম্বন করে চলা যেমন দরকার তেমনি বরকত নষ্ট হয়ে যায় যেসব কারণে সেগুলো থেকে সতর্কতা অবলম্বন করাও একান্ত জরুরি। সে কারণগুলোর অন্যতম হচ্ছে, যে কোনো পাপের কাজ পরিহার করে চলা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে পাপ কাজ পরিহার করে চলার তাওফীক দান করুন এবং সার্বিক বিষয়ে বরকত লাভে আমাদেরকে ধন্য করুন, আমীন॥ ❑❑

---

[১৩] *সহীহ মুসলিম হা : ৯৯৩।*
[১৪] *সহীহ বুখারী হা : ২১১০।*
[১৫] *আবূ দাউদ হা : ২৬০৬।*
[১৬] *তিরমিযী হা : ১৮০৫।*
[১৭] *সহীহ মুসলিম হা : ২০৩৪।*
[১৮] *তিরমিযী হা : ১৭৪৮।*
[১৯] *আবূ দাউদ হা : ৩৭৬৪।*

দারসুল হাদীস/من أحاديث الرسول

কর্মের ফল সর্বশেষ কর্মের উপর নির্ভরশীল

শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা ❖

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَعْظَمِ المسْلِمِينَ غَنَاءً عَنِ المسْلِمِينَ، فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا» فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ، وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الحَالِ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَلَى المشْرِكِينَ، حَتَّى جُرِحَ، فَاسْتَعْجَلَ الموْتَ، فَجَعَلَ ذُبَابَةَ سَيْفِهِ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْرِعًا، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، فَقَالَ: «وَمَا ذَاكَ» قَالَ: قُلْتَ لِفُلاَنٍ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهِ» وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِنَا غَنَاءً عَنِ المسْلِمِينَ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لاَ يَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمَّا جُرِحَ اسْتَعْجَلَ الموْتَ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: «إِنَّ العَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الجَنَّةِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالخَوَاتِيمِ»

হাদীসের অনুবাদ : সাহ্‌ল ইবনু সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নাবী ﷺ-এর সঙ্গে থেকে যেসব মুসলিম যুদ্ধ করেছেন তাদের একজন ছিলেন (মুশরিকদের বিরুদ্ধে) ভীষণ বেগে আক্রমণকারী। নবী ﷺ তার দিকে তাকিয়ে বললেন : যে ব্যক্তি কোনো জাহান্নামীকে দেখতে পছন্দ করে সে যেন এই লোকটির দিকে তাকিয়ে দেখে। (এ কথা শুনে) লোকদের মধ্য থেকে একলোক সেই লোকটির অনুসরণ করে। আর সে লোকটি তখনও মুশরিকদের বিরুদ্ধে ভীষণভাবে আক্রমণ করে যাচ্ছিলো। এমতাবস্থায় সে লোকটি যখম হয়ে তাড়াতাড়ি মৃত্যু কামনা করল। তাই সে তার তরবারীর ধারালো দিকটি নিজের বুকে রেখে তার ওপর চাপ দিলো। ফলে তা তার দু'কাঁধের মাঝ দিয়ে তার বক্ষ ভেদ করলো। তখন অনুসরণকারী লোকটি নাবী ﷺ-এর কাছে দৌড়ে এসে বললো : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি (সত্যিই) আপনি আল্লাহর রাসূল। নাবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তা কেন বলছো? লোকটি বললো : আপনি অমুক ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছিলেন : যে ব্যক্তি কোনো জাহান্নামীকে দেখতে পছন্দ করে সে যেন এ লোকটিকে দেখে নেয়, অথচ লোকটি অন্যান্য মুসলিমের চেয়ে (মুশরিকদের বিরুদ্ধে) তীব্র আক্রমণকারী ছিল। তাই আমার ধারণা ছিলো লোকটির মৃত্যু এ অবস্থায় হবে না। (তাই আমি তার পিছু নিয়ে দেখতে পেলাম) যখন সে আঘাত পেল, তাড়াতাড়ি মৃত্যু কামনা করল এবং আত্মহত্যা করে ফেললো। নাবী ﷺ একথা শুনে বললেন : নিশ্চয় কোনো বান্দা জাহান্নামীদের আমল করেন কিন্তু আসলে সে জান্নাতী। আবার কোনো বান্দা জান্নাতের অধিবাসীদের আমল করেন কিন্তু আসলে সে জাহান্নামী। নিশ্চয়ই আমলের ভালো-মন্দ নির্ভর করে তার শেষ অবস্থার ওপর।[২০]

রাবী পরিচিতি : সাহল এটি তাঁর পরিবর্তীত নাম। জন্মের পর তাঁর বাবা তার নাম রাখেন হুযন। রাসূল ﷺ মদীনায় আসার পর তার নাম রাখেন 'সাহল' তাঁর কয়েকটি উপনাম আছে। যেমন : আবুল আব্বাস, আবু মালিক ও আবু ইয়াহইয়া। পিতার নাম সা'দ ইবনু মালিক। মদীনার খাবরাজ গোত্রের বনু সায়িবের সন্তান। একজন বিখ্যাত আনসারী সাহাবী। পিতা সা'দও সাহাবী ছিলেন। রাসূল ﷺ-এর হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে তিনি মদীনাতে জন্মগ্রহণ করেন। হিজরতের পূর্বেই তাঁর পিতা সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইসলাম গ্রহণ করেন। ফলে মুসলিম পরিবারে মুসলমান হিসেবে তিনি বেড়ে ওঠেন। রাসূল ﷺ যখন হিজরত করে মদীনায় আগমন

❖ *মুহাদ্দিস, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।*

[২০] *সহীহ বুখারী হা : ৬৬০৭।*

করেন তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বছর। হিজরী দ্বিতীয় সালে বদর যুদ্ধের সময় তিনি সাত বছরের এক বালক মাত্র। বদর যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বেই তাঁর পিতা সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু মৃত্যুবরণ করেন। মাত্র সাত বছর বয়সে তিনি পিতৃহারা হন। হিজরী তৃতীয় সনে উহুদ যুদ্ধের সময় তাঁর সমবয়সী ছেলেদের সাথে মিলে মদীনার নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। হিজরী পঞ্চম সনে যখন খন্দক যুদ্ধ হয় তখন তিনি দশ বছরের এক বালক মাত্র। তা সত্ত্বেও তীব্র আবেগ ও উৎসাহের সাথে খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হিজরী এগারো সনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের সময় তাঁর বয়স ছিলো ১৫ বছর। তাই তিনি রাসূল ﷺ-এর সাথে কোনো যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। খিলাফতে রাশেদার সময়কালে তাঁর জীবনের বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না।

হাদীস বর্ণনা : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় যদিও অল্প বয়সের এক বালক ছিলেন তবুও তিনি তাঁর নিকট থেকে অনেক হাদীস শুনেছিলেন। রাসূল ﷺ-এর ওফাতের পর উবাই ইবনু কা'ব, আসিম ইবনু আদী, আমর ইবনু আবাসা প্রমুখ খ্যাতিমান সাহাবীদের নিকট থেকে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর নিকট থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম আবূ হুরাইরাহ, ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, যুহরী, আবু সুহাইল সুবহী, আব্বাস ইবনু সাহল, ইয়াহইয়া ইবনু মাইমুন হাযরামী, আমর ইবনু জাবির হাযরামী প্রমুখ।

তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা : সাহল ইবনু সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৮৮টি, তন্মধ্যে ২৮টি ইমাম বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি রাসূল ﷺ-কে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। প্রতিটি কাজ ও আচার আচরণে তিনি রাসূল ﷺ-এর অনুসরণ করতে চেষ্টা করতেন। সত্য বলা ছিল তাঁর চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

মৃত্যু : হিজরী ৯১ সালে তিনি মদীনাতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন মদীনায় মৃত্যুবরণকারী সর্বশেষ সাহাবী।

হাদীসের ব্যাখ্যা :

أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَعْظَمِ الْمُسْلِمِينَ غَنَاءً عَنِ الْمُسْلِمِينَ، فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا مَعَ النَّبِيِّ

নাবী ﷺ-এর সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এক মুসলিম ব্যক্তি যিনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বেগে আক্রমণকারী এক ব্যক্তি অর্থাৎ যে সকল মুসলিমগণ রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত ছিলেন তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি এমনভাবে যুদ্ধ করছিলেন যে, সে একাই মুসলিমদের পক্ষে যেন যথেষ্ট ছিল মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য। এমন প্রচণ্ডভাবে সে যুদ্ধ করে যাচ্ছিল।

فَقَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا»

তখন নাবী ﷺ বললেন : যে ব্যক্তি কোনো জাহান্নামী লোককে দেখতে চায় সে যেন এই (প্রচণ্ড বেগে যুদ্ধকারী) লোককে দেখে। অর্থাৎ ঐ লোকটি যদিও মুসলিমদের পক্ষ হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সে লোক আসলে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করছিল না। এ বিষয়টি আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। বরং লোকটি তার বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধ করছিল। যাতে আল্লাহর দীনের বিজয়ের কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। অথবা রাসূল ﷺ-কে জানানো হয়েছিলো যে, যদিও লোকটি এখন মুসলিমদের পক্ষে যুদ্ধ করছে এবং তার উদ্দেশ্যও ভালোই ছিল কিন্তু পরক্ষণে সে এমন কাজ করবে যা তার বর্তমানের এই ভালো কর্মকে বিনষ্ট করে দেবে। ফলে সে জাহান্নামী হবে। তাই নাবী ﷺ ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, ঐ লোকটি জাহান্নামী। এতে জনা গেল যে, কোনো ব্যক্তি যদি ভালো কাজও করে কিন্তু তার উদ্দেশ্য ভালো না থাকে তাহলে ঐ কাজ তার কোনো উপকারে আসবে না। অনুরূপভাবে ভালো কাজ সৎ উদ্দেশে সম্পাদন করার পর আবার যদি এমন কোনো কাজ করে ফেলে যে কাজ দ্বারা তার ঈমান বিনষ্ট হয় তাহলেও তার ঐ ভাল কাজের কোনো মূল্য থাকে না।

حتى جرح فاستعجل الموت ঐ লোকটি যুদ্ধ করতে করতে আহত হলো, ফলে আর ধৈর্য্য ধরতে না পেরে

দ্রুত মৃত্যু কামনা করলো। অর্থাৎ আহত হওয়ার বেদনায় ধৈর্য্য হয়ে অতি তাড়াতাড়ি মৃত্যু কামনা করতে থাকলো যা ঈমানের পরিপন্থী। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন :

لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ المَوْتَ مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ

কোনো বিপদের কারণে তোমাদের কেউ যেন অবশ্যই মৃত্যু কামনা না করে।[২১]

অতএব বিপদের মুহূর্তে মৃত্যু কামনা করা রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। অনুরূপভাবে তা সবরের বিপরীত এবং আল্লাহর ফায়সালার প্রতি নারাজ।

فَجَعَلَ ذُبَابَةَ سَيْفِهِ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ

অতঃপর সে তার তারবারীর ধারালো দিক তার বুকের ওপর ঠেকিয়ে তার ওপর চাপ প্রয়োগ করলো ফলে তার বক্ষভেদ করে দু'কাঁধের মাঝ দিয়ে বেরিয়ে গেল। অর্থাৎ সে তার নিজের তরবারী দ্বারা আত্মহত্যা করল। আত্মহত্যা করা সর্বসম্মতিক্রমে কবীরা গোনাহ। কবীরা গোনাহকারী যদি তাওবা না করে মারা যায় তাহলে সে আল্লাহর ইচ্ছাধীন। আল্লাহ চাইলে তাকে ক্ষমা করতে পারেন। আবার চাইলে তাকে শাস্তিও দিতে পারেন। আর আত্মহত্যা করার পর আত্মহত্যাকারী তাওবা করার কোনো সুযোগ পান না। তাই তার শাস্তির আশংকাই বেশি। আর যদি আত্মহত্যাকারী মনে করে যে, আমার প্রাণ চাইলে আমি রাখবো, আর না চাইলে আমি আত্মহত্যা করবে এতে কার কী! অর্থাৎ আত্মহত্যা করা যদি হালাল মনে করে তাহলে হারাম কাজ হালাল মনে করার কারণে সে কাফের হয়ে যায়। আর কাফের ব্যক্তি চির জাহান্নামী।

«إِنَّ العَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ

"নিশ্চয় অনেক বান্দা এমন আছে যে, সে জাহান্নামীদের আমল করতে থাকে অথচ সে জান্নাতী" অর্থাৎ কোনো বান্দা তার জীবনের অনেক অংশ জাহান্নামীদের আমলের মধ্যে ব্যয় করে। অতঃপর তার বোধোদয় হয় যে, সে ভুলের মধ্যে লিপ্ত আছে ফলে তাওবা করে জাহান্নামীদের কাজ ছেড়ে জান্নাতীদের আমল করতে থাকে এবং এর ওপর তার মৃত্যু হয়, ফলে সে জান্নাতী হয়।

وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الجَنَّةِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ

অনুরূপভাবে কোনো ব্যক্তি জান্নাতীদের আমল করতে থাকে অথচ সে জাহান্নামী। অর্থাৎ জীবনের বড় একটা অংশজুড়ে সে জান্নাতীদের আমল করতে থাকে অতঃপর জীবনের শেষ প্রান্তে এমন কাজ করে বসে যে, তার পূর্বের সকল ভালো কর্মের ফল বিনষ্ট হয়ে যায়। অতঃপর সে আর তাওবা করার সুযোগ না পেয়ে মৃত্যুবরণ করার কারণে সে জাহান্নামী হয়।

وَإِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالخَوَاتِيمِ কর্মের ফল সর্বশেষ কর্মের ওপর নির্ভরশীল, অর্থাৎ যার সর্বশেষ কর্ম ভালো হবে সে ভালো ফল পাবে। আর যে লোকের সর্বশেষ কর্ম এমন খারাপ হবে যে, তার আগের ভালো কর্মের ফল বিনষ্ট করে ফেলবে ফলে সে মন্দের ফল ভোগ করবে।

হাদীসের শিক্ষা :

১. সকল ভালো কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করতে হবে।

২. আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে না হলে ভালো কাজেরও ভালো ফল পাওয়া যাবে না।

৩. নাবীগণ গায়েব জানেন না। তবে আল্লাহ নবুওয়াতের নিদের্শনস্বরূপ অনেক বিষয় তাদেরকে অবহিত করেন যা পরে ঘটবে।

৪. সর্বদা আল্লাহর ভয় ও আশার মধ্যে জীবন-যাপন করতে হবে।

৫. ভালো কর্মের ওপর মৃত্যুর জন্য আল্লাহর নিকট আবেদন করতে হবে।

৬. তাকদীর আল্লাহ গোপন রেখেছেন যাতে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি অলস না হয়ে যায়। আর অসৎ লোক আরো বেপরোয়া না হয়।

৭. শেষ ভালো যার সব ভালো তার।

আল্লাহ যেন আমাদের সকলকেই ঈমানের উপর মৃত্যু দান করেন। আমীন!

[২১] *সহীহ বুখারী হা : ৫৬৭১।*

সূচিপত্র

প্রবন্ধ / المقالة

রাজকীয় মেহমান হিসেবে হজ্জ পালন অনুপম অনুভূতির লেখচিত্র

আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী❖

ইহ ও পরলৌকিক কল্যাণের আধার হলো ইসলাম। ইসলামের বিধি-বিধানসমূহ মানবজাতির পথ নির্দেশিকা। ঐশী ও পার্থিব সাহায্যের নিশ্চয়তা দেয় ইসলাম। সুনানে আবু দাউদে উল্লেখ আছে, যখন কেউ ঘর থেকে বের হয় এবং বলে, বিসমিল্লাহি তাওক্কালতু 'আলাল্লাহি, লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহ-[১] তাকে বলা হয়; তুমি হিদায়াতপ্রাপ্ত, নিরাপদ ও সুরক্ষিত হলে। হোটেল থেকে বের হয়ে গাড়িতে আরোহণ করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার শেখানো দু'আ পাঠ করি

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (١٣) وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ.

"মহান সত্তার পবিত্রতা জ্ঞাপন করছি, যিনি আমাদের জন্য একে বশীভূত করেছেন। আমরা একে বশীভূত করতে সক্ষম নই। বস্তুত আমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করছি।"[২]

অবশ্য এই দু'আ শেষে নবী ﷺ তিনবার আলহামদু লিল্লাহ এবং তিনবার আল্লাহু আকবার বলতেন, তারপর দু'আ করতেন। হে আল্লাহ, আমরা তোমার কাছেই আমাদের এই সফরকে কল্যাণময় করার প্রার্থনা করি এবং পাপ থেকে দূরে রাখার আবেদন করি।[৩]

সুপ্রিয় পাঠকমণ্ডলী, আমাদের সকলের জানার উদ্দেশ্যে নবী ﷺ পঠিত আরো একটি দু'আ বেশ প্রসিদ্ধ। তিনি বলতেন :

اَللّهُمَّ إِنَّا نَسأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا البِرَّ وَالتَّقوَى، وَمِنَ العَمَلِ مَا تَرضَى، اَللهم هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ . اَللهم أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ .

হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা তোমার কাছে প্রার্থনা করছি আমাদের এই যাত্রায় পুণ্যকর্ম, সংযমশীলতা এবং তোমার সন্তোষজনক কার্যকলাপ। হে আল্লাহ! আমাদের এ যাত্রাকে আমাদের জন্য সহজ করে দাও। আমাদের থেকে ওর দূরত্ব গুটিয়ে নাও। হে আল্লাহ! তুমিই সফরের সঙ্গী। আর পরিবার পরিজনের জন্য (আমাদের) প্রতিনিধি। হে আল্লাহ! সফরের কষ্ট ও ক্লান্তি থেকে, ভয়ংকর দৃশ্য থেকে এবং বাড়ি ফিরে ধন-সম্পদ, পরিবার ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে কোনো অপ্রীতিকর দৃশ্য থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৪]

দয়ার নবী ﷺ-এর বাচনিক উদ্ধৃতিতে আমরা আরো কতিপয় দু'আ ও আদবের বিষয়ে অবহিত হই। তিনি আল্লাহর নিকট ভ্রমণকারীদের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ দু'আ করতেন। তিনি বলতেন : হে আল্লাহ! তাদের সফরসঙ্গী হও এবং পরিবারের রক্ষণ কর। এই দু'আ আজও মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য। সফরে বের হওয়ার আগে পরিবারের যে কেউ এই দু'আ পাঠ করতে পারেন-

أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ

"তোমাদের দ্বীন, তোমাদের সততা এবং তোমাদের কর্মসমূহের পরিণাম আল্লাহকে সঁপে দিলাম।"[৫] ইসলামে ভ্রমণকে শুধু গন্তব্যে উপনীত হওয়া নয়, বরং ইবাদতের সুযোগ হিসেবে বিবেচনা করে। যাত্রার আগে ও পরে আল্লাহর নিকট দু'আ করা; নামাজের যত্ন নেওয়া প্রভৃতি সুন্নাহর মধ্যে রয়েছে গভীর নিরাপত্তা ও সীমাহীন বরকত। বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলী! আমি কিন্তু প্রসঙ্গান্তরে যাইনি। বরং হোটেল মিলিনিয়াম থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার পর মদীনা অভিমুখে রওনার প্রস্তুতি প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আলোকপাত করতে চাই যা সবার জানা দরকার।

নবী ﷺ মদীনা হিজরতের সময় যে পথ অনুসরণ করেছিলেন তা ছিলো নিতান্তই অব্যবহৃত ও বন্ধুর পথ। তিনি অতি সন্তর্পণে আবু বকরকে (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সাথে নিয়ে মদীনার

❖ *ভাইস প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস প্রফেসর ও সাবেক ডিন, স্কুল অব আর্টস, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।*

[১] *আবু দাউদ হা : ৫০৯৫।*
[২] *সূরা যুখরুফ আয়াত : ১৩-১৪।*
[৩] *সহীহ মুসলিম হা : ১৩৪২।*
[৪] *সহীহ মুসলিম হা : ১৩৪২।*
[৫] *সহীহ হাদীস, আবু দাউদ ২৬০৩ ও অন্যান্য বিশুদ্ধ সূত্রে।*

বিপরীত দিকে রওনা হন। উদ্দেশ্য শত্রুরা যাতে কোনোভাবে টের না পায়।

তিনি প্রথমে গারে সওরে তিনদিন অবস্থান করে শত্রুদের গতিবিধি এড়ানোর চেষ্টা করেন। পথিমধ্যে হযরত আবু বকরের কন্যা আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহু খাবার পৌঁছে দিতেন। আর আমির ইবনে ফুহাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু ছাগল চড়িয়ে নবীজির উটের পদ চিহ্ন মুছে দিতেন। এক সময় গুহা হতে বেরিয়ে পশ্চিম উপকূল ধরে উত্তরের দিকে অগ্রসর হন। দুর্গম পথ অতিক্রম কালে আব্দুল্লাহ ইবনু উরাইকিত নামক জনৈক দক্ষ অমুসলিম পথপ্রদর্শক নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সহায়তা দেন। নবীর মদীনা যাত্রাপথে কুদাইদ, আসফান, মাবরুকবযাহরান অতিক্রম করে কুবা গ্রামে পৌঁছেন। সেখানে মসজিদ নির্মাণ করে চারদিন অবস্থান করেন। সংক্ষেপে বলা যায় যে, নবীজি প্রথমে মক্কার দক্ষিণের দিকে গোপনে গমন করেন। গারে সওরে তিনদিন অবস্থানের পর পশ্চিম উপকূলীয় পথ ধরে উত্তর দিকে যাত্রা করেন। আজকের জেদ্দা ও রাবিগ অঞ্চলের নিকটবর্তী মরুভূমি পার হয়ে বদর ও কুবা হয়ে মদীনায় প্রবেশ করেন।

আমরা জানি যে, বর্তমানে মক্কা থেকে মদিনার দূরত্ব প্রায় ৪৫০ কি.মি.। মক্কা-মদিনা হাইওয়ে অনুসরণ করে মদিনা যাওয়া যায়। নবীজির যামানার পথ-নকশা আধুনিককালে হুবহু অনুসৃত হয় না। তবে কখনো বা পাশ দিয়ে, কখনো ওই ঐতিহাসিক স্থানের ওপর দিয়ে নতুন পথ রচিত হয়েছে।

আমরা গাড়িতে উঠে মক্কা-মদীনা হাইওয়ে অনুসরণ করে মাত্র অনধিক ৫ ঘণ্টার মধ্যে মদীনায় উপনীত হই। হারামাইন এক্সপ্রেসে মদীনা পৌঁছাতে সময় লাগে মাত্র ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রযাত্রা মানুষকেও স্পিডাইট করে তুলেছে। যাহোক, আমরা মসজিদে নববীর সামান্যই পশ্চিমে সুবিশাল পাঁচ তারা হোটেল যমযম মদীনাতে নির্দিষ্ট রুমে অবস্থান নিই।

মদীনায় পৌঁছেই প্রয়োজনীয় কাজ সেরে আমরা মসজিদে নববীতে নামাজের জন্য উপস্থিত হই। ইতোমধ্যে নসুকের মাধ্যমে সরকারিভাবে মসজিদে নববীর রিয়াজুল জান্নাতে যাবার অনুমতি পেয়ে যাই। মসজিদে নববীর বিশালত্ব ও আধুনিক কারুকার্য সত্যিই মুগ্ধ করার মতো। বিশ্ব ঐতিহ্যের অসাধারণ নিদর্শন দৃষ্টে আমাদের প্রাণ জুড়িয়ে যায়।

বিশ্ব ঐতিহ্যের পরম পবিত্র স্মারক মসজিদে নববী সম্পর্কে যৎসামান্য আলোকপাত প্রয়োজন। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র রওজা সংযুক্ত এই মসজিদকে কেন্দ্র করেই ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার দ্বার উন্মোচিত হয়েছিলো। হিজরতের পর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিজ হাতে তৈরি এই মসজিদের সঙ্গে মিশে আছে সারা বিশ্বের মুসলমানের শ্রদ্ধা ও আবেগ। বরকতময় মসজিদটির আবাদ ও আইন সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“অবশ্যই যেন মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকওয়ার ওপর প্রথম দিন থেকে তা বেশি হকদার যে, তুমি সেখানে সালাত কায়েম করতে দাঁড়াবে। সেখানে এমন লোক আছে, যারা উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করতে ভালোবাসে। আর আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।”[৬]

হিজরতের বছর ৬২২ সালে শুরু হয় মসজিদে নববীর নির্মাণ কাজ। ৬২৩ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত সাতমাস সময় লেগেছে কাজ শেষ হতে। আমরা জানি যে, মদীনায় প্রবেশের পর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উটনি কাসওয়া, যে স্থানটিতে বসে পড়েছিলো সেইখানে বিনির্মিত হয় এই ঐতিহাসিক মসজিদে নববী। মদীনার দুই এতিম বালক সাহল ও সোহায়েলের কাছ থেকে ১০ দিনারের বিনিময়ে জায়গা কিনে নেওয়া হয়। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু স্বতঃস্ফূর্তভাবে মূল্যটি পরিশোধ করেন। ক্রীত ওই জমির ছোট এক অংশে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য বাসস্থান এবং বাকি পুরো অংশে তৈরি হয় মসজিদ।

বুখারি ও মুসলিম হাদীসগ্রন্থে বিদ্ধৃত নবীজির বাচনিক উদ্ধৃতিতে সবিশেষ গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। পৃথিবীর শীর্ষ পবিত্র স্থানগুলোর মধ্যে মসজিদে নববী দ্বিতীয়। একাধিক হাদীসসূত্রে জানা যায়, মসজিদে নববীতে এক ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা মসজিদে হারাম ছাড়া পৃথিবীর যে কোনো মসজিদে এক হাজার ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের চেয়েও উত্তম।[৭]

---

[৬] *সূরা আত-তাওবা আয়াত : ১০৮।*
[৭] *সহীহ বুখারী হা : ১১০, সহীহ মুসলিম হা : ১৩৯৪।*

বৃহদাকারের এই মসজিদটি যুগে যুগে বহু সংস্কার ও সম্প্রসারণ হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের বর্ণনা অনুযায়ী, রাসূল ﷺ-এর যুগে মসজিদের ভিত্তি ছিলো ইটের, ছাদ ছিলো খেজুরের ডালের এবং খুঁটি ছিলো খেজুর গাছের কাণ্ডের। সে সময় মসজিদটির পরিধি ছিলো আনুমানিক ২৫০০মি.। ৭ম হিজরীতে মসজিদে নববীর প্রথম সম্প্রসারণ রাসূল ﷺ নিজেই সম্পন্ন করেন। তখন আয়তন বেড়ে দাঁড়ায় ২৪৭৫ বর্গমিটার। এরপর দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মসজিদে নববীর সংস্কারে হাত দেন। মসজিদের চারপাশে জমি কিনে এর আয়তন বৃদ্ধি করেন। সম্মানিত পাঠকমণ্ডলী, আমরা যখন মসজিদ বানাই, তখন কি জমি কিনি? না সরকারি জমি, অন্যের জমি (জবর দখলতুল্য) দিয়ে মসজিদ বানাই? রাসূল ﷺ তো পারতেন। ঘোষণা দিলেই যে কেউ অকাতরে জমি ছেড়ে দিতেন। কিন্তু নাহ! তিনি তা করেননি। কেননা, একজনের সম্পদ অপরের জন্য হারাম।

যাহোক, এরপর ৬৫০ সালে তৃতীয় খলিফা যুন্নুরায়েন হযরত ওসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু মসজিদে নববী সংস্কারে আগ্রহ পোষণ করেন। তিনি সর্বপ্রথম খোদাইকৃত পাথর ও প্লাস্টারের দেওয়াল তৈরি করেন। খোদাইকৃত পাথর ও লোহার ব্যবহারে পিলার ও স্তম্ভ নির্মাণ করেন। ছাদে ব্যবহার করেন কাঠ। ৭০৭ সালে উমাইয়া শাসক ওলীদ ইবনে আব্দুল মালেক-এর নির্দেশে মক্কার গভর্ণর আব্দুল আজিজ মসজিদে নববীর সংস্কার সাধন করেন। এতে মসজিদের পরিসর বৃদ্ধি পেয়ে ৬৪৪০ বর্গমিটারে দাঁড়ায়। তিনি মসজিদে ৪টি মিনার ও একটি মেহরাব স্থাপন করেন। এতদ্ব্যতীত অভ্যন্তরীণ স্তম্ভগুলোকে মর্মর পাথর ও সোনার কারুকাজ দিয়ে সু-সজ্জিত করেন। এসময় স্তম্ভের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৩২টিতে। তিনি উম্মাহাতুল মুমিনীন হযরত আয়শা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর কক্ষটি মসজিদে নববীর অন্তর্ভুক্ত করেন। স্থাপন করেন নয়নাভিরাম সবুজাভ গম্বুজ।

আব্বাসীয় খলিফা আল মাহদীর আমলে মসজিদের আয়তন সম্প্রসারিত হয়ে ৮৮৯০ বর্গমিটারে উন্নীত হয়। তিনি ৬০টি জানালা ও ২৪টি দরজা সংযোগ করেন। ৬৫৪ হিজরিতে আগুনে ক্ষতিগ্রস্থ হলে আল-মুতাসিম মসজিদে নববীর পুনঃনির্মাণ করেন। কিন্তু ৬৫৬ হিজরীতে তাতারীদের বাগদাদ হামলার কারণে পুনঃনির্মাণ কাজ স্থগিত হয়ে যায়। এ ধারাবাহিকতায় মামলুক আমলে মসজিদে নববীর নির্মাণসহ সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়। দরজা-জানালাসমূহ পিতল দিয়ে সুশোভিত করা হয়।

উসমানি খলিফা সুলতান সোলায়মানের আমলে গম্বুজ মেরামত করা হয়। গম্বুজের ওপর সোনায় মোড়ানো চাঁদ স্থাপন করেন। ১২২৭ হিজরীতে ফাটল দেখা দিলে সুলতান আব্দুল মজিদ সংস্কার করেন। তখন মসজিদের আয়তন পরিবর্ধিত হয়ে ১০৩০ বর্গমিটারে উন্নীত হয়। তিনি আরো ৫টি দরজা সংযুক্ত করেন এবং প্রাচীরের উচ্চতা ১১ মিটারে বৃদ্ধি করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ১৭০টি গম্বুজ ও ৬০০টি তেল প্রদীপ স্থাপন করেন মসজিদকে আলোকিত করে তোলেন।

১৯০৯ সালে এই মসজিদের ওসীলাতে আরব উপদ্বীপে বিদ্যুতায়ন শুরু হয়। মসজিদে নববীর মুখপাত্র হাত্তাবের বক্তব্য অনুযায়ী এসময় এখানে ২৪২৭টি বাতি সংযোজিত হয়েছিলো। ১৯৭৩ সালে বাদশাহ ফয়সাল মসজিদের পশ্চিম দিকে প্রায় ৩৫ হাজার ৫০০ বর্গমিটার জায়গার বরাদ্দ দেন এবং সমগ্র এলাকা জুড়ে বৈদ্যুতিক পাখা, সাউণ্ড সিস্টেম এবং বিশেষ ছাতা প্রতিস্থাপন করেন।

মসজিদে নববীতে ব্যবহৃত ছাতার প্রযুক্তিগত সংযোজন সত্যিই মনোমুগ্ধকর। এই ছাতার প্রস্ফুটন, ব্যবহার দেখে মন জুড়িয়ে যায়। রোদ, বৃষ্টি ও গরম থেকে মুসল্লিদের রক্ষা করে। আর এই ছায়ায় দাঁড়িয়ে মানুষ এক ধরনের জান্নাতি প্রশান্তি অনুভব করে। এই ছাতা প্রতিস্থাপনের ইতিহাস বড়ই চমকপ্রদ। ১৯৯০ এর দশকে বাদশাহ ফাহাদের শাসনামলে ছাতা স্থাপনের কাজ শুরু হয়। মক্কা ও মদীনার মুসল্লীদের আরামদায়ক ইবাদতের জন্য উন্নয়নের অংশ হিসেবেই শুরু হয় মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ প্রকল্প। ২০১০ সালে ছাতার দ্বারা অত্যাধুনিক শেড সিস্টেম চালু হয়, জার্মান প্রযুক্তি নির্ভর ২০ মিটার উঁচু ৫৭টি ছাতা মসজিদে নববীর চত্বরে শোভা পাচ্ছে। প্রখর রোদে এই ছাতা ৮/১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমাতে সাহায্য করে।

বাদশাহ খালিদ বিন আব্দুল আজিজের পরে বাদশাহ ফাহাদের দীর্ঘ ১০ বছরের সংস্কার ও সম্প্রসারণে তা নতুন অবকাঠামো লাভ করে। এতে মসজিদে আয়তন বৃদ্ধি পেয়ে ৮২ হাজার মিটারে দাঁড়ায়। এ সময় মসজিদটিতে চলন্ত সিঁড়ি স্থাপন করা হয়। ❑❑

সূচিপত্র

কুরআনবাদের স্বরূপ সন্ধান ও সংশয় নিরসন

শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক্ব *

(৩য় পর্ব)

(২) সুন্নাহ কুরআনের অস্পষ্ট বিষয়কে সুস্পষ্ট করে :

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ;

﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ﴾

"তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত প্রদান কর এবং রুকুকারীদের সঙ্গে রুকু কর।"[৮]

আলোচ্য আয়াতে কারীমা প্রমাণ করে যে, সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান করা ওয়াজিব এবং যারা রুকু করে তাদের সঙ্গে রুকু করাও ওয়াজিব। কিন্তু কিভাবে সালাত আদায় করতে হবে ও যাকাত কিভাবে দিতে হবে, তার বণ্টননীতি কী হবে -কুরআনুল কারীম তার সুস্পষ্ট বর্ণনা পেশ করেনি। এছাড়াও রুকু করার নির্দেশ কুরআনে এসেছে, কিন্তু কিভাবে রুকু করতে হবে বা রুকু করার পদ্ধতি কী হবে সে বিষয়ে কুরআন সুস্পষ্ট বর্ণনা করেনি। রাসূল ﷺ তার সুস্পষ্ট বর্ণনা পেশ করেছেন যা সুন্নায় বিদ্যমান। সালাতের রাকা'আত সংখ্যা কত, কোন কোন সময়ে তা আদায় করতে হবে, রুকুর পদ্ধতি কেমন, যাকাত কখন কিভাবে আদায় করতে হবে যাবতীয় কিছুর সুস্পষ্ট বর্ণনা হাদীসে স্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে। সহীহ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, রাসূল ﷺ বলেছেন ; صلوا كما رأيتموني أصلي "তোমরা সালাত আদায় কর যেমনিভাবে তোমরা আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছ।"[৯]

অনুরূপ যাকাতের বিষয়টিও কুরআনুল কারীমে মুজমাল বা অস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। যাকাতের পরিমাণ কত, কত সম্পদ হলে যাকাত ওয়াজিব, তার শর্ত কী কী এসব বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা সুন্নাহ বা হাদীসে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল, সুন্নাহ কুরআনের অস্পষ্ট বিষয়গুলোর সুস্পষ্টতা নিশ্চিত করেছে। হাদীস ব্যতীত এসব বিষয় বুঝা সম্ভব নয় বিধায় হাদীসের আবশ্যকতা অনিবার্য।

(৩) সুন্নাহ কুরআনে বর্ণিত আম বা ব্যাপক বিষয়গুলোকে সুনির্দিষ্ট করে :

বিবাহের জন্য হারামকৃত নারীদের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

"আল্লাহ তোমাদের ওপর তোমাদের মা-গণকে, তোমাদের কন্যাদের, তোমাদের বোনদের, তোমাদের ফুফুদের ও খালাদের, তোমাদের ভাতিজি ও ভাগ্নিদের, তোমাদের দুধমা ও দুধবোনদের, তোমাদের শাশুড়ী ও তোমাদের সহবাসকৃতা স্ত্রীদের কন্যাগণ যারা তোমাদের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হয়েছে তাদেরকে হারাম করেছেন। আর তোমাদের যেসকল স্ত্রীদের সাথে তোমরা সহবাস করনি তাদের কন্যাদের বিবাহ করতে কোনো গুনাহ নেই এবং তোমাদের ঔরসজাত সন্তানদের স্ত্রীদেরকেও তোমাদের ওপর হারাম করেছেনন এবং দু'বোনকে একত্রে বিবাহ করাও হারাম করেছেন। পূর্বে যা অতিবাহিত হয়েছে তা ভিন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল দয়ালু।"[১০]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

---

* মুদাররিস, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা ও পাঠাগার সম্পাদক- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, ঢাকা মহানগর।

[৮] সূরা আল-বাকারা আয়াত : ৪৩।

[৯] সহীহ বুখারী হা : ৬৩১।

[১০] সূরা আন-নিসা আয়াত : ২৩।

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ.﴾

"অন্যের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ নারীগণও তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ। তবে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসদাসী বাদে। তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ নারী ব্যতীত সকল নারীদের মোহরের অর্থের বিনিময়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাওয়া বৈধ।"[১১]

আলোচ্য আয়তদ্বয় প্রমাণ করে যে, উল্লেখিত নারীগণ ব্যতীত সমস্ত নারীদেরকে বিবাহ করা বৈধ। আর এটা সকল নারীদের ক্ষেত্রে সার্বজনীন বা ব্যাপক বিধান। সুন্নাহ এ বিধানকে নির্দিষ্ট করে এক স্ত্রীর বর্তমানে তার বোনকে বিবাহ করা হারাম করেছে এবং স্ত্রীর বর্তমানে তার ফুফু ও খালাকে বিবাহ করা হারাম করেছে।[১২]

আবার মিরাছ বণ্টনের ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾

"আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে তোমাদের নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, ছেলে সন্তানের জন্য দুই কন্যা সন্তানের অংশের সমান সম্পত্তি।"[১৩]

আলোচ্য আয়াতে কারীমাটি সকল ছেলে সন্তানকে সম্পৃক্ত করেছে। অর্থাৎ : ধর্মের ভিন্নতা থাকলেও সম্পত্তিতে সকল ছেলেরা মেয়েদের দ্বিগুণ অংশ পাবে। আর সুন্নাহ এ বিধানকে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট করেছে : পৈত্রিক সম্পত্তিতে কাফির সন্তানের কোনো অংশ নেই।

নাবী ﷺ বলেছেন : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. "মুসলিম কাফিরের সম্পত্তিতে ওয়ারিস হবে না এবং কাফিরও মুসলিমের সম্পত্তিতে ওয়ারিস হবে না।"[১৪]

[১১] *সূরা আন-নিসা আয়াত : ২৪।*
[১২] *সহীহ বুখারী আয়াত : ৫১০৮, সহীহ মুসলিম হা : ১৪০৮।*
[১৩] *সূরা আন-নিসা আয়াত : ১১।*
[১৪] *সহীহ বুখারী হা : ৬৭৬৪, সহীহ মুসলিম হা : ১৬১৪।*

(৪) সুন্নাহ কুরআনুল কারীমের সাধারণ বিধানে সীমাবদ্ধতা আনয়ন করে :

আল্লাহ সুবহানবাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

"আর চোর ও চোরনী উভয়েরই হাত কেটে দাও, তারা যা অর্জন করেছে তার প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহর পক্ষ হতে দৃঃষ্টান্তমূলক শাস্তি। এবং আল্লাহ তা'আলা পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।"[১৫]

আলোচ্য আয়াতে কারীমায় প্রমাণিত হয় যে, চোরাই সম্পদ কম কিংবা বেশি যাই হোক না কেন, তাতেই চোরের হাত কাটতে হবে। চোরের হাত কাটার পরিমাণ কতটুকু, ডান হাত নাকি বাম হাত এর কোনো কিছুই উল্লেখিত আয়াতে কারীমাতে বর্ণিত হয়নি। কারণ, আয়তে কারীমাতে শুধু চোরের হাত কাটার সাধারণ বিধান বর্ণিত হয়েছে, কোনো সীমারেখা বর্ণিত হয়নি। হাদীস তার সীমাবদ্ধতা বর্ণনা করেছে।

রাসূল ﷺ বলেছেন; تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا "রুবউ দীনার (এক দীনারের এক চতুর্থাংশ) কিংবা তার বেশি চুরি করলে তার হাত কাটা হবে।"[১৬]

(৫) সুন্নাহ নতুন বিধান পণয়ন করে :

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾

"বল, আমার ওপর যে ওহী করা হয়েছে তাতে মানুষ যা আহার করে তার কিছুই হারাম পাই না। তবে মৃত, প্রবহমান রক্ত ও শুকরের গোস্ত ব্যতীত, কারণ তা অপবিত্র কিংবা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে যবেহ করা হয়েছে।"[১৭]

[১৫] *সূরা আল-মায়িদা আয়াত : ৩৮।*
[১৬] *সহীহ বুখারী হা : ৬৭৮৯, সহীহ মুসলিম হা : ১৬৮৪।*
[১৭] *সূরা আল মায়িদা আয়াত : ১৪৫।*

আলোচ্য আয়াতে কারীমা হতে প্রমাণিত হয় যে, আয়াতে উল্লেখিত চারটি বস্তু যথাক্রমে : মৃত, প্রবাহিত রক্ত, শুকরের গোস্ত ও বিসমিল্লাহ না বলে যবাই করা প্রণীর গোস্ত ভক্ষণ করা হারাম। এ ব্যতীত শরীয়তে আর কোনো কিছুই হারাম নেই। অতঃপর সুন্নাহ আরো কিছু বিষয়কে হারাম সাব্যস্ত করে নতুন বিধান প্রণয়ন করেছে। যেমন ছা'লাবাহ আল খুশানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন :

حرم رسول الله ﷺ لحوم الخمر الأهلية

"রাসূল ﷺ গৃহপালিত গাধার গোস্ত হারাম করেছেন।"[১৮]

এছাড়াও আরো কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো কুরআন দ্বারা নয় বরং সুন্নাহ বা হাদীস দ্বারা হারাম সাব্যস্ত হয়েছে। যেমন :

নাবী ﷺ বলেছেন كل ذى ناب من السباع فأكله حرام "প্রত্যেক সুঁচালো দাঁতওয়ালা হিংস্র প্রাণী- তা ভক্ষণ করা হারাম।"[১৯]

সুন্নাহ আন-নাবাবী বা হাদীস অস্বীকার করার হুকুম :

দ্বিধাহীনভাবে বলা যায় যে, সুন্নাহ অস্বীকার করা কুফুরি। যে ব্যক্তি সুন্নাহ অস্বীকার করে সে কাফির এবং এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। কেননা সুন্নাহ বা হাদীস অস্বীকারকারী ও রিসালাত অস্বীকারকারীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আর হাদীস অস্বীকারকারীদের ইতিহাস ও নবুওয়াত অস্বীকারকারীদের ইতিহাস এক ও অভিন্ন। সুতরাং হাদীস অস্বীকার করা ও নবুওয়াত অস্বীকার করার মতবাদ এক ও অভিন্ন এবং উভয়টির সূত্রপাত একই সময়কাল থেকে বিধায় তাদের হুকুমও এক।

সালাফগণ হাদীস অস্বীকারকারীদের সুস্পষ্ট বর্ণনা পেশ করেছেন- তারা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্ট এবং তারা কোনোক্রমেই ইসলামের অনুসারী নয়। কারণ তারা দ্বীনের অধিকাংশ বিষয়ই অস্বীকার করে এরপরও তারা কিভাবে মুসলিম হতে পারে? তারা কিভাবে সালাত আদায় করে যেমন : নাবী ﷺ বলেছেন, صلوا كما رأيتموني أصلي "তোমরা সালাত আদায় কর যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছ।"[২০]

[১৮] সহীহ বুখারী হা : ৫৫২৭।
[১৯] সহীহ মুসলিম হা : ১৯৩৩, ইবনু মাজাহ হা : ৩২৩৪, তিরমিযী- ১৪৭৯
[২০] সহীহ বুখারী হা : ৬০০৮।

তারা যাকাতের নিসাব বা অংশগুলো কিভাবে বুঝে বা উপলব্ধি করে যার বিস্তারিত বিবরণ একাধিক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে!! তারা বাইতুল্লাতে হজ্জ পালন করে কিভাবে? অথচ নাবী ﷺ বলেছেন : خذوا عني مناسككم.... "তোমরা হজ্জের বিধানাবলী আমার থেকে গ্রহণ কর।"[২১]

তারা কিভাবে শরীয়তের শাস্তিবিধান কার্যকর করে!! যেমন : যেনার শাস্তি, চোরের শাস্তি, মিথ্যা অপবাদের শাস্তি, মদপান করার শাস্তিসহ অন্যান্য শাস্তিবিধান তারা কিভাবে কার্যকর করে! যেমন : নাবী ﷺ বলেছেন :

خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا: الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَرَمْيٌ بِالْحِجَارَةِ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ ".

"তোমরা আমার থেকে (শারঈ বিধান) গ্রহণ কর, তোমরা আমার থেকে (শারঈ বিধান) গ্রহণ কর, আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য বিধান দিয়েছেন। বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিত নারীর ব্যভিচার প্রমাণিত হলে তার শাস্তি একশ' বেত্রাঘাত ও পাথর মেরে হত্যা। অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর ব্যভিচার প্রমাণিত হলে তার শাস্তি একশ' বেত্রাঘাত এক বছরের নির্বাসন।"[২২]

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হাদীস অস্বীকারকারীরা শরীয়তের অধিকাংশ বিধান পরিত্যাগ করেছে এবং অস্বীকার করেছে। শরীয়তের অধিকাংশ আমল তারা পরিত্যাগ করেছে। অতএব হাদীস অস্বীকারকারীরা কাফির' এতে কোনো সন্দেহ নেই। এমনকি তাদের কাফির বলতে অস্বীকার করা কিংবা সংশয় প্রকাশ করাও কুফুরি।

হাদীস অস্বীকারের বিষয়ে সালাফগণের বক্তব্য :

প্রখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন :

من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب قوله عزوجل : يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب فكان الرجم مما أخفوا.

"যে রজমের বিধানকে অস্বীকার করে সে কুরআনুল কারীমকেই এমনভাবে অস্বীকার করল যে, সে আল্লাহ

[২১] সহীহ মুসলিম হা : ১২৯১।
[২২] সহীহ মুসলিম হা : ১৬৯০।

তা'আলার কথা অনুভব করতে পারল না। আল্লাহ তা'আলার কথা, হে কিতাবধারীরা! তোমাদের কাছে আমাদের রাসূল এসেছেন, তিনি তোমাদেরকে অনেক বিষয় বর্ণনা করেন যা তোমরা গোপন করতে।[২৩] আর রজমের বিধান যা তোমরা গোপন করেছ।"[২৪]

আইয়্যুব আস-সিখতিয়ানী রহ বলেন :

إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وحدثنا من القرآن فاعلم أنه ضال مضل.

"যখন তুমি কোনো ব্যক্তিকে সুন্নাহর কথা বলবে, সে বলে এসব বিষয় ছাড় আমাদেরকে কুরআনের কথা বল, তখন বুঝবে সে পথভ্রষ্ঠ ও অন্য কেউ পথভ্রষ্টকারী।"[২৫]

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন নাসরুল মারুযী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (২০২–২৯৪হিঃ) বলেন : যে ব্যক্তি একটি সুন্নাহ অস্বীকার করল তার জন্য সুন্নাহর যেগুলো আমরা উল্লেখ করেছি কিংবা উল্লেখ করিনি তার সমস্তই অস্বীকার করা অবধারিত হয়ে গেল।[২৬]

ইবনু হাযম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন :

لو أن امرأ قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا باجماع الأمة ولا كان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل وأخرى عند الفجر لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم الصلاة ولا حد للأكثر في ذلك, وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال.

"কোনো ব্যক্তি যদি বলে আমরা কুরআনে যা পেয়েছি তাই গ্রহণ করব, তাহলে সে সকল উলামার ঐকমত্যে সে কাফের। কেননা অবশ্যই তার জন্য সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ার সময় হতে রাত্রী পর্যন্ত মাত্র এক রাকা'আত সালাত আদায় করা আবশ্যক হবে। আর ফজরের সময় অন্য রাকা'আত সালাত আদায় করতে হবে। কেননা এটাই তো সর্বনিম্ন সালাত, যাকে সালাত নামে নামকরণ করা যায়। কারণ এক্ষেত্রে আধিক্যের কোনো সীমারেখা নেই। এ ধরনের কথা যে বলে সে কাফের, মুশরিক এবং তার রক্ত ও সম্পদ হালাল।"[২৭]

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন :

مُحَمَّد ﷺ مبعوث إلى جميع الثقلين,وإنسهم وجنهم – فمن اعتقد أنه يسوغ لأحد الخروج عن شريعته وطاعته فهو كافر يجب قتله.

নাবী মুহাম্মাদ ﷺ জ্বিন ইনসান - সকলেরই কাছে তিনি নাবী ও রাসূল হিসাবে প্রেরিত, সুতরাং যে বিশ্বাস রাখে যে, রাসূল ﷺ-এর শরীয়ত ও তাঁর আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়ার সুযোগ আছে, সে কাফের এবং তাকে হত্যা করা বৈধ।[২৮]

ইমাম আস-সুয়ূতী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন : নিশ্চয় যে ব্যক্তি নাবী ﷺ এর কাওলী ও ফেলী হাদীসকে দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে মারুফ হওয়ার শর্ত আরোপ করে অস্বীকার করে সে কাফের এবং সে দীনের আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেল। আর তার হাশর হবে ইহুদী ও নাসারাদের সাথে।[২৯]

শাইখ বিন বায (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন :

السنة هي الأصل المعتمدة بعد كتاب الله عزوجل باجماع أهل اهل العلم قاطعة, وهي حجة قائمة مستقلة على جميع الأمة, من جحدها أو أنكرها أو زعم أنه يجوز الاعراض عنها والاكتفاء بالقرآن فقط ضل ضلالا بعيدا, وكفر كفرا أكبر, وارتد عن الإسلام بهذا المقال.

"আলেমগণের ঐকমত্যে কুরআনের পর সব থেকে নির্ভরযোগ্য মূলনীতি হলো সুন্নাহ। সকল উলামার ঐকমত্যে তা স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত শারঈ দলীল। যে তা অস্বীকার করবে কিংবা অপছন্দ করবে অথবা মনে করবে যে, তা থেকে বিমূখ হওয়া এবং শুধু কুরআনের ওপর নির্ভর করা বৈধ, তাহলে সে পথভ্রস্ট হল এবং অনেক বড় কুফুরি করল। আর এ কথা বলাতে সে মুরতাদ হয়ে গেল।"[৩০] (চলবে ইনশা আল্লাহ)

---

[২৩] *সূরা আল-মায়িদা আয়াত : ১৫।*
[২৪] *মুস্তাদরাক আলাস সহীহাইন- ৮৬০৯।*
[২৫] *আল কিফায়াতু ফি ইলমির রিওয়াতি- ১৬পৃ.*
[২৬] *আস সুন্নাহ - ১০৩পৃ.*
[২৭] *আল ইহকামু ফি উসুলিল ইহকাম- ২/৮০পৃ.।*
[২৮] *মাজমুউল ফাতাওয়া - ৩/৪২২পৃ.।*
[২৯] *মিফতাহুল জান্নাত- ৬পৃ.।*
[৩০] *মাজমুউ ফাতাওয়া বিন বায- ৯/১৭৬পৃ.।*

দাঈর অপরিহার্য গুণাবলি

আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল মাদানী*

দাওয়াহ ইল্লাল্লাহ বা আল্লাহর পথে আহবান করা হল, শ্রেষ্ঠ এবং মর্যাদাপূর্ণ কাজ। এটিই ছিল যুগে যুগে সকল নবী-রাসূলের মূল দায়িত্ব এবং মিশন। এটি সরাসরি মহান আল্লাহর নির্দেশ। সে কারণে দাওয়াতের কাজ করা সাধ্য অনুযায়ী প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরজ। যার যতটুকু সামর্থ্য ও যোগ্যতা আছে সে তার সর্বোচ্চটুকু দিয়ে দাওয়াতের পথে অবদান রাখবে।

আল্লাহর পথে আহ্বানকারী (দাঈ) তিনি সেই সম্মানিত ব্যক্তি, যিনি মানবকে সত্যের পথে আহ্বান করেন, সৎকাজের আদেশ দেন ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি শুধু মানুষকে আহ্বান করেন না নিজেও হন সেই আহ্বানের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। তার দাওয়াত মুখে শুধু নয়, চরিত্র ও আচরণে প্রতিফলিত হয়।

দাঈ মানে শুধু বক্তা বা লেখক নন। তিনি সেই মানুষ, যার প্রতিটি কথা, আচরণ ও হাসিতেও দাওয়াতের আলো ঝলমল করে।

সে কারণে তার মধ্যে কিছু গুণাবলি থাকা অপরিহার্য।

নিম্নে একজন দাঈর মধ্যে যেসব গুণাবলি থাকা অত্যন্ত জরুরি সেগুলো কয়েকটি উল্লেখ করা হলো :

১. আল্লাহর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক :

আল্লাহর পথের আহ্বানকারী তাকওয়া বা আল্লাহভীতি, হারাম থেকে দূরে থাকা, আমলে সালেহ বা সৎকর্ম এবং অধিক পরিমাণে দোয়া ও জিকিরের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবেন।

২. মানুষের সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক : একজন দাঈ মানুষের সাথে আন্তরিকতাপূর্ণ আচরণ, সাহায্য, সহানুভূতি এবং ভালোবাসার মাধ্যমে হৃদয়ের সেতুবন্ধন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবেন।

৩. উদার ও প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গি :

দাঈর জন্য সংকীর্ণতামুক্ত ও সচ্ছ হৃদয়ের অধিকারী হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সর্বক্ষেত্রে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোকে ন্যায়-নীতি ও ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি লালন করবেন।

৪. যাদেরকে দাওয়াত দেওয়া হবে তাদের সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখা :

তিনি যাদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছাবেন তাদের সংস্কৃতি, মানসিকতা ও প্রয়োজন সম্পর্কে জ্ঞান রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

এটি তাদের সাথে কথা বলা এবং আচরণের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

৫. সহনশীলতা ও ক্ষমা :

দাওয়াতের বিরোধিতা বা শত্রুতার মুখোমুখি হলে কিংবা কেউ কথা ও আচরণে কষ্ট দিলে সে ক্ষেত্রে সহনশীলতা এবং ক্ষমার মনোভাব বজায় রেখে সংযমপূর্ণ কোমল আচরণ করবে।

৬. কথা ও কাজের মিল :

একজন দাঈর কথা এবং কাজের মিল থাকা অপরিহার্য।

৭. সত্যের ওপর অবিচলতা ও একাগ্রতা :

দাঈ চাপ, ভয় বা প্রলোভনের মুখেও হক থেকে সরবে না।

৮. বিনয় ও নম্রতা :

যে ব্যক্তি দাওয়াতের পথে কাজ করবে সে অহংকারমুক্ত জীবন গঠন করবে। অহংকার শুধু হারাম নয় বরং কবিরা গুনাহ।

তার কর্তব্য, সবার সঙ্গে ভদ্রতা ও নম্রতাপূর্ণ আচরণ করা।

* দাঈ, জুবাইল দাওয়াহ এণ্ড গাইডেন্স সেন্টার, সৌদি আরব।

বিনয় ও নম্রতা মানুষকে কাছে টানে এবং অহংকার ও উগ্রতা মানুষকে দূরে ঠেলে দেয়।

৯. সাহস ও দৃঢ়তা :

একজন দাঈ হবে সাহসী এবং নির্ভীক। সে হবে সত্যের পক্ষে ইস্পাত কঠিন চিত্তের অধিকারী। সে কখনো ভীরু ও কাপুরুষতার পরিচয় দেবে না। প্রয়োজনে সে ত্যাগ স্বীকার করার জন্যও প্রস্তুত থাকবে।

১০. ইখলাস বা আন্তরিকতা :

সকল দাওয়াতি কাজ শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা অপরিহার্য। এক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিগত যশ-খ্যাতি, অর্থ উপার্জন কিংবা দুনিয়াবি স্বার্থচিন্তা থাকবে না।

১১. সবর বা ধৈর্য্য :

দাওয়াতের ফলাফল বিলম্বিত হলেও সে আশা না হারিয়ে অবিচলভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। কেননা ধৈর্য্য সফলতার চাবিকাঠি।

১২. লেবাস-পোশাক এবং ব্যক্তিত্বে পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি থাকা :

আল্লাহর প্রতি আহ্বানকারী পরিচ্ছন্ন ও মার্জিত পোশাক পরিধান করবেন, দাওয়াতের মর্যাদার সাথে মানানসই ব্যক্তিত্ব বজায় রাখবেন এবং সম্মানজনকভাবে নিজেকে মানুষের সামনে উপস্থাপন করবেন।

১৩. জ্ঞানের উপরে ভিত্তি করে দাওয়াত দেওয়া :

দাঈর জন্য আবশ্যক হচ্ছে, তিনি যে বিষয়ের দিকে মানুষকে আহ্বান করবেন সেই বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন ও পড়াশোনা করা এবং সমসাময়িক বিষয়াদির দিকে নজর রাখা।

জ্ঞান হল আলো। জ্ঞান হল শক্তি। জ্ঞান মানুষকে শক্তি এবং সাহসিকতার সাথে পথ চলতে সাহায্য করে।

একজন দাঈ এই সকল গুণাবলি অর্জন করে নিজের জীবনকে দাওয়াতের ময়দানে জীবন্ত উদাহরণে পরিণত করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন।

মহান আল্লাহ তওফিক দান করুন। আমিন।❑❑

ডেঙ্গু প্রতিরোধে সকল জনসাধারণের করণীয় :

ডেঙ্গু কী : ডেঙ্গু একটি ভাইরাস জ্বর। এডিস মশা ডেঙ্গু ভাইরাসের একমাত্র বাহক। এ মশার কামড়ে ডেঙ্গু ছড়ায়। এডিস মশা দিনের বেলায়, সাধারণত ভোরে এবং সন্ধ্যায় কামড়ায়।

ডেঙ্গুজ্বরের সাধারণ লক্ষণ :

❖ জ্বর (শরীরে তাপমাত্রা হঠাৎ বৃদ্ধি পায়)

❖ মাথা ব্যথা, চোখের পিছনে ব্যথা, পেটে ব্যথা, মাংসপেশী ও হাড়ে ব্যথা (বিশেষতঃ মেরুদন্ডে ব্যথা) বমি-বমি ভাব।

❖ শরীরে হামের মত দানা দেখা দেওয়া।

ডেঙ্গুজ্বরের ব্যবস্থাপনা :

❖ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডেঙ্গু জ্বর ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে এমনিতেই সেরে যায়।

❖ রাগীকে উপসর্গ অনুসারে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দিতে হবে এবং বিশ্রামে রাখতে হবে। প্রচুর পানি ও তরল খাবার খাওয়াতে হবে।

❖ দ্রুত জ্বর কমানো একান্ত জরুরী। এজন্য মাথা ধোয়া, ভিজা কাপড় দিয়ে গা মোছা এবং প্যারাসিটামল খেতে দেয়া যেতে পারে। এ্যাসপিরিন জাতীয় ঔষধ কোনভাবেই খেতে দেয়া যাবে না।

❖ মারাত্বক (হেমোরেজিক) ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হলে রোগীকে অবিলম্বে হাসপাতালে/ডাক্তারের কাছে নিতে হবে।

ডেঙ্গুজ্বর প্রতিরোধে করণীয় :

❖ এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ ডেঙ্গু প্রতিরোধের প্রধান উপায়।

❖ বাড়ির ভিতর/বাহির/ছাদ এবং আনাচে-কানাচে পড়ে থাকা অপ্রয়োজনীয় পাত্রসমূহ ডাষ্টবিনে ফেলে দিন। বাড়ির আশপাশের ঝোপঝাড় এবং আঙ্গিনা পরিষ্কার রাখুন।

❖ ব্যবহার যোগ্য পাত্রসমূহে (যেমনঃ বালতি, ড্রাম, ফলের ও গাছের টব, ফ্রিজ এবং এয়ার কন্ডিশনারের নীচের পানি ভর্তি পাত্র ইত্যাদি) পানি কোনভাবেই যেন একনাগাড়ে ০৫ (পাঁচ) দিনের বেশী জমে না থাকে সেদিকে লক্ষ্যে রাখুন এবং প্রয়োজনে অপসারণ করুন।

❖ অব্যবহৃত গাড়ির টায়ার, নির্মাণকাজে ব্যবহৃত চৌবাচ্চা, পরিত্যক্ত টিনের কৌটা, প্লাষ্টিকের বোতল/ক্যান, গাছের কোটর, পরিত্যক্ত হাড়ি, ডাবের খোসা ইত্যাদিতে ০৫ (পাঁচ) দিনের বেশি যেন পানি জমে না থাকে সেদিকে লক্ষ্যে রাখুন এবং প্রয়োজনে অপসারণ করুন।

মনে রাখতে হবে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য সকল নাগরিকের সক্রিয় সহযোগীতা একান্ত প্রয়োজন”

(জনসচেতনতায়, ঢাকা মশক নিবারণী দপ্তর)

তাহাজ্জুদ : আল্লাহ্ যখন প্রথম আসমানে

তরিকুল ইসলাম মাদানী ❈

ভূমিকা : ইবাদতের বিস্তৃত ভুবনে তাহাজ্জুদ স্বলাত এমন এক অনন্য নফল আমল, যা আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দা ও তাঁর নৈকট্য লাভের বিশেষ মাধ্যম। নিস্তব্ধ রাত, গভীর ঘুম ত্যাগ করে আল্লাহর দিকে ফিরে দাঁড়ানো যে ইবাদতের নাম–তাই হলো তাহাজ্জুদ। এটি ফরজ নয়; কিন্তু কুরআনুল কারীম ও সহীহ হাদীসে এর যে মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে, তা একে মুত্তাকীদের ইবাদতের শিখরে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

গভীর রাতে আরামের ঘুম ত্যাগ করে বান্দা যখন আল্লাহর নৈকট্য ও রহমত পাওয়ার আশায় তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে, তখন আল্লাহ খুবই খুশি হন। তাহাজ্জুদ সালাতের মাধ্যমে বান্দার আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয়। এ সালাত আদায়ে পুণ্যময় জীবনের পথ প্রশস্ত হয়। আল্লাহ তা'আলা এ সালাত আদায়কারীর গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

﴿تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ﴾

"তারা শয্যা ত্যাগ করে, তাঁদের প্রতিপালককে আশায় ও ভয়ে ভয়ে ডাকে এবং তাঁদেরকে যে রিজিক দান করেছি তা হতে তারা ব্যয় করে।"[৩১] তাহাজ্জুদ সালাতের গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবি ﷺ বলেন, ফরজ সালাতের পর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট হলো তাহাজ্জুদের সালাত।"[৩২]

রাসূল ﷺ মদিনায় হিজরত করে সর্বপ্রথম যেই ঘোষণা দিয়েছিলেন :

وَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ

"তখন তিনি সর্বপ্রথম যে কথা বললেন তা এইঃ হে মানুষগণ! তোমরা সালামের প্রসার ঘটাও, খাদ্য দান কর এবং মানুষ ঘুমিয়ে থাকাবস্থায় (তাহাজ্জুদ) নামায আদায় কর। তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা সহীহ-সালামতে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৩৩]

তাহাজ্জুদ স্বলাতের পরিচয় : আরবি (تهجد) 'তাহাজ্জুদ' শব্দের আভিধানিক অর্থ রাত্রি জাগরণ বা নিদ্রা ত্যাগ করে রাতে স্বলাত আদায় করা। এর অপর নাম হলো (قيام الليل) কিয়ামুল্লাইল।

শরিয়তের পরিভাষায় : রাত দ্বিপ্রহরের পর ঘুম থেকে জেগে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে স্বলাত আদায় করা হয় তা-ই 'সালাতুত তাহাজ্জুদ' বা কিয়ামুল্লাইল।

التهجد هو صلاة التطوع في الليل بعد النوم، وقيل هو الصلاة بعد العشاء، ولو قبل النوم.

"তাহাজ্জুদ হলো ঘুমের পর রাতে আদায়কৃত নফল সালাত। আবার কেউ কেউ বলেন : এটি ইশার স্বলাতের পর আদায়কৃত সালাত যদিও তা ঘুমানোর আগে হোক।"

তাহাজ্জুদ স্বলাতের গুরুত্ব : আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন :

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

"আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ আদায় করুন, এটা আপনার জন্য অতিরিক্ত। আশা করা যায় আপনার রব আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে।"[৩৪]

عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا، يَقُولُ اشْتَكَى النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ.

"জুনদাব رضي الله عنه থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, নবী ﷺ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে এক রাত বা দু' রাত তিনি (তাহাজ্জুদের জন্য) উঠেননি।"[৩৫]

❈ সভাপতি, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ, নরসিংদী জেলা ও শিক্ষক, মাদরাসা দারুল হাদীস সালাফিইয়াহ্, পাঁচরুখী, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ

[৩১] সূরা আস-সাজদাহ : ১৬, ১৭।

[৩২] সহীহ মুসলিম।

[৩৩] ইবনু মাজাহ হা : ১৩৩৪, ৩২৫১।

[৩৪] সূরা বনী ইসরাঈল আয়াত : ৭৯।

মহানবী ﷺ নিজে তাহাজ্জুদ স্বলাত আদায় করতেন এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের আদায়ের প্রতি উৎসাহিত করতেন। যেমন রাসূল সা তার মেয়ে ফাতিমা রা ও মেয়ের জামাতা আলি রা কে তাহাজ্জুদ স্বলাতের জন্য উৎসাহিত করেছেন।

হাদীসে এসেছে :

أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ ـ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ـ لَيْلَةً فَقَالَ " أَلاَ تُصَلِّيَانِ ". فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا. فَانْصَرَفَ حِينَ قُلْنَا ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا. ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهْوَ مُوَلٍّ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَهْوَ يَقُولُ "وَكَانَ الإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً

“আলী ইব্নু আবূ ত্বলিব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত : আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ এক রাতে তাঁর কন্যা ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর নিকট এসে বললেন : তোমরা কি সালাত আদায় করছ না? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের আত্মাগুলো তো আল্লাহ্ তা’আলার হাতে রয়েছে। তিনি যখন আমাদের জাগাতে ইচ্ছা করবেন, জাগিয়ে দিবেন। আমরা যখন একথা বললাম, তখন তিনি চলে গেলেন। আমার কথার কোনো জবাব দিলেন না। পরে আমি শুনতে পেলাম যে, তিনি ফিরে যেতে যেতে আপন উরুতে করাঘাত করছিলেন এবং কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করছিলেন- “মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্ক প্রিয়। ”[৩৬]

রাসূল ﷺ তাহাজ্জুদ স্বলাতের জন্য এত বেশি গুরুত্ব দিতেন যে, এত দীর্ঘ সময় কীয়াম করতেন যার ফলে পা ফুলে যেত।

হাদীসে এসেছে :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ حَتّٰى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا فَلَمَّا كَثُرَ لَحْمُهُ صَلّٰى جَالِسًا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ

“আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আল্লাহ্‌র নবী ﷺ রাতে এত অধিক সলাত আদায় করতেন যে, তাঁর পদযুগল ফেটে যেতো। ‘আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আল্লাহ্ তো আপনার আগের ও পরের ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দিয়েছেন? তবু আপনি কেন তা করছেন? তিনি বললেন, আমি কি আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়া পছন্দ করব না? তাঁর মেদ বর্ধিত হলে তিনি বসে সলাত আদায় করতেন। যখন রুকু করার ইচ্ছে করতেন, তখন তিনি দাঁড়িয়ে কিরাআত পড়তেন, তারপর রুকূ‘ করতেন।”[৩৭]

ঘুম থেকে উঠার পর করনীয় :

❒ ঘুম থেকে উঠে চেহারা থেকে ঘুমের আবেশ মুছে ফেলা এবং সূরা আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াত তিলাওয়াত করা :

আবদুল্লাহ্ ইব্নু ‘আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি একদা নবী ﷺ-এর সম্পর্কে বলেছেন (বড় হাদীসের অংশ)

حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ،

“রাত যখন অর্ধেক হয়ে গেল তার কিছু পূর্বে কিংবা কিছু পরে আল্লাহর রসূল ﷺ জাগলেন। তিনি বসে হাত দিয়ে তার মুখমন্ডল থেকে ঘুমের আবেশ মুছতে লাগলেন। অতঃপর সূরা আল-‘ইমরানের শেষ দশটি আয়াত তিলাওয়াত করলেন।”[৩৮]

❒ ঘুম থেকে আস্তে, ধীরে, স্থিরচিত্তে ওঠে নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করা :

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾

“যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র জন্য যিনি আমাদের মৃত্যুদানের পর আবার আমাদের পুনর্জীবিত করেছেন। আর প্রত্যাবর্তন তাঁর পানেই।”[৩৯]

[৩৫] সহীহ বুখারী হা : ১১২৪।
[৩৬] সহীহ বুখারী হা : ১১২৭, সূরা আল-কাহ্‌ফ আয়াত : ৫৪।
[৩৭] সহীহ বুখারী হা : ৪৮৩৭।
[৩৮] সহীহ বুখারী হা : ১৮৩।
[৩৯] সহীহ বুখারী হা : ৬৩১২।

নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করে, দুআ করলে কবুল হয়। অতঃপর উযু করে (স্বলাত আদায় করলে) তার স্বলাত কবুল হয়।

উবাদাহ ইবনু সামিত রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যে ব্যক্তি রাতে জেগে ওঠে (নিম্নোক্ত) দু'আ পড়ে

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ.

“এক আল্লাহ্ ব্যতীত প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজ্য তাঁরই। যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই। তিনিই সব কিছুর উপরে শক্তিমান। যাবতীয় হাম্‌দ আল্লাহ্‌রই জন্য, আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র, আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহ্ মহান, গুনাহ হতে বাঁচার এবং নেক কাজ করার কোনো শক্তি নেই আল্লাহ্‌র তাওফীক ব্যতীত। অতঃপর বলে, হে আল্লাহ্ ! আমাকে ক্ষমা করুন। উক্ত দু'আ পাঠ করে, দুআ করলে কবুল হয়। অতঃপর উযু করে (সালাত আদায় করলে) তার সালাতও কবুল হয়।”[৪০]

অপর হাদীসে এসেছে:

أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ "

“আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত : আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মহামহিম আল্লাহ্ তা'আলা প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকাকালে পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে ঘোষণা করতে থাকেনঃ কে আছে এমন, যে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আছে এমন যে, আমার নিকট চাইবে। আমি তাকে তা দিব। কে আছে এমন যে আমার নিকট ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষমা করব।”[৪১]

❒ ঘুম থেকে উঠে দুই হাত তিনবার ধৌত করা :

কেননা হাদীসে এসেছে :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ

“আবু হুরায়রা রা আনহু হতে বর্ণিত, নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে উঠবে তখন সে যেন তিনবার হাত না ধোয়া পর্যন্ত পাত্রে না ঢুকায়। কারণ সে জানেনা যে, তার হাত রাতে কোথায় ছিল।”[৪২]

❒ পাশে থাকা স্ত্রী/স্বামীকে ঘুম থেকে ডেকে দিতে হবে : স্বামী পাশে থাকা স্ত্রীকে ঘুম থেকে ডেকে দিবে। স্ত্রী তার স্বামীকে ডেকে দিবে। না উঠলে চোখে পানি ছিটিয়ে দিতে হবে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى، ثُمَّ أَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ، ثُمَّ أَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ

“আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ব্যক্তির ওপর রহম করুন, যে রাত্রের কিছু অংশ জেগে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে, অতঃপর তার স্ত্রীকেও জাগিয়ে দেয়, সেও তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে। যদি তার স্ত্রী জাগ্রত হতে না চায় তবে তার মুখমন্ডলে পানির ছিঁটা দেয়। ঐ মহিলার ওপরও আল্লাহ তা'আলা রহম করুন, যে রাত্রের কিছু অংশ জেগে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে। অতঃপর তার স্বামীকেও জাগিয়ে দেয়, সেও তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে। যদি সে জাগ্রত হতে না চায় তবে তার মুখমন্ডলে পানির ছিঁটা দেয়।”[৪৩] (চলবে ইনশাআল্লাহ)

[৪০] *সহীহ বুখারী হা : ১১৫৪।*

[৪১] *সহীহ বুখারী হা : ১১৪৫।*

[৪২] *সহীহ মুসলিম হা : ৫৩০।*

[৪৩] *সহীহ নাসায়ী হা : ১৬১০।*

দু'আ : হৃদয়ের সংলাপ, রবের জবাব

আবু মাহদী মামুন আব্দুল্লাহ ❄

ভূমিকা :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক, রহমত ও মহিমার একমাত্র উৎস। দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয়নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর ওপর, যিনি মানবতার জন্য সর্বোত্তম পথপ্রদর্শক।

মানুষের জীবন কখনো হাসিতে উজ্জ্বল, আবার কখনো অশ্রুতে ভেজা। কখনো দুঃখ-দুর্দশা তার হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে, আবার কখনো অগণিত আশা-আকাঙ্ক্ষা হৃদয়কে আলোড়িত করে। জীবনের প্রতিটি বাঁকে মানুষ এক অদৃশ্য শক্তির আশ্রয় খোঁজে, যে শক্তি তাকে ভরসা, শান্তি এবং মুক্তির দিশা দেয়। সেই আশ্রয়, সেই অবলম্বন একমাত্র আল্লাহ। আর বান্দা ও রবের মাঝে এই হৃদয়সংলাপের মাধ্যমই হলো দু'আ।

দু'আ কেবল কিছু উচ্চারিত শব্দ নয়, এটি আসলে হৃদয়ের গভীরতম আর্তি, বিনয় ও আত্মসমর্পণের প্রতিচ্ছবি। বান্দা যখন তার অসহায়ত্ব স্বীকার করে আল্লাহর সামনে হাত তোলে, তখন সে আসলে নিজের অস্তিত্বকেই রবের হাতে সঁপে দেয়। এ সময় তার অশ্রু হয়ে ওঠে ভাষা, আর তার নীরবতা হয়ে ওঠে আর্তনাদ। দু'আর মাধ্যমেই আসে আল্লাহর কাছ থেকে সকল কিছুর ফায়সালা। দু'আ করার মাধ্যমে বান্দা স্বীকার করে যে, সে অসহায়, আর আল্লাহই সর্বশক্তিমান। তাই দু'আ ইবাদতের মূল মর্মবস্তু। আজকের প্রবন্ধে "দু'আ: হৃদয়ের সংলাপ, রবের জবাব" শিরোনামে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হলো।

❖ দু'আর সংজ্ঞা :

(ক) আভিধানিক অর্থ :

দু'আ (الدعاء) শব্দটি আরবি, যার অর্থ الطلب চাওয়া বা السؤال আবেদন করা।[৪৪]

আল ফাইউমি বলেন,

دعوت الله أدعوه دعاء: ابتهلت إليه بالسؤال، ورغبت فيما عنده من الخير، ودعوت زيدا: ناديته وطلبت إقباله

"আমি আল্লাহকে ডাকলাম অর্থাৎ আমি বিনীত হৃদয়ে তাঁর দরবারে প্রার্থনা জানালাম এবং তাঁর অসীম দয়ার ভাণ্ডার থেকে কল্যাণ কামনা করলাম। আর 'আমি জায়েদকে ডাকলাম'-এর অর্থ হলো, আমি তাকে সম্বোধন করলাম ও তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম।"[৪৫]

(খ) পারিভাষিক অর্থ : ইসলামী শরী'আতে দু'আ বলতে, سؤال العبد ربه جلب ما ينفعه أو دفع ما يضره "প্রতিপালকের কাছে বান্দার কল্যাণ চাওয়া বা অকল্যাণ থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রার্থনা।"[৪৬]

আল খাত্তাবী তার "শানুদ দু'আ" গ্রন্থে বলেন,

الدعاء استدعاء العبد ربه الله العناية، واستمداده إياه المعونة

"দু'আ হলো বান্দা তার রব আল্লাহকে সাহায্যের জন্য ডাকে এবং আল্লাহর থেকে সহায়তা প্রার্থনা করে।"

মৌলিকতা হলো, তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ নির্ভরতা প্রকাশ করা এবং নিজের শক্তি ও সামর্থ্যের অস্বীকৃতি জানানো। এটি দাসত্বের প্রতীক এবং মানুষের দুর্বলতার অনুভূতি জাগ্রত করে। পাশাপাশি, এতে আল্লাহর প্রশংসা করা এবং তাঁর দানশীলতা ও অনুগ্রহ স্বীকার করার বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

❖ দু'আর প্রকারভেদ :

দু'আ দুই প্রকার। যথা, ১.دعاء المسألة (চাওয়ার দু'আ) ২. دعاء العبادة (ইবাদতের দু'আ)

১. دعاء المسألة (প্রার্থনার দু'আ) : এটি হলো সেই দু'আ, যখন বান্দা আল্লাহ তা'আলার কাছে কল্যাণ লাভ বা অনিষ্ট দূর করার জন্য প্রার্থনা করে।[৪৭]

২. دعاء العبادة (ইবাদতের দু'আ) : এটি হলো সেই দু'আ, যখন বান্দা আল্লাহ তা'আলার বিধান অনুযায়ী ইবাদত করে,

---

❄ আক্বীদাহ ও দাওয়াহ বিভাগ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব এবং দাওরায়ে হাদীস, মাদরাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার, ঢাকা।

৪৪ মাকায়িসুল লুগাহ ২/২৭৯; লিসানুল আরব ১৪/২৫৭।
৪৫ মিসবাহুল মুনীর ১/১৯৪।
৪৬ আল মানহাজ ফি শুআবিল ঈমান ১/৫২২।
৪৭ মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১৫/১০।

তাঁকে একমাত্র উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে না। এই ইবাদতের মাধ্যমে বান্দা জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির আশা করে।[৪৮]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন, কুরআনে دعاء 'দু'আ' ও دعوة 'দাওয়াহ' শব্দ দুটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে-একটি হলো ইবাদতের দু'আ এবং অপরটি হলো প্রার্থনার দু'আ।[৪৯]

শাইখ আবদুর রহমান বিন নাসির আস-সা'দী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন, কুরআনে দু'আর ব্যাপারে যে সমস্ত নির্দেশ এসেছে, আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে দু'আ করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং দু'আ করার প্রশংসা করা হয়েছে-এসবের মধ্যে দু'আ মাসআলা ও দু'আ ইবাদাহ উভয়ই অন্তর্ভুক্ত।[৫০]

কিছু বিদ্বান দু'আকে ৩ ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা,

১. আল্লাহর তাওহীদ ও প্রশংসা করা।

২. ক্ষমা ও রহমতের জন্য প্রার্থনা করা।

৩. দুনিয়াবী কোনো বিষয় চাওয়া।[৫১]

ইবাদতকারী প্রার্থনাকারী, যেমন আবেদনকারীও প্রার্থনাকারী। আর এ দু'টি অর্থেই আল্লাহর এই বাণীকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে : وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

"তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।"[৫২]

কেউ বলেছেন: "আমাকে আনুগত্য করো, আমি তোমাদের কাছে আসব।" আর কেউ বলেছেন : "আমাকে প্রার্থনা করো, আমি তোমাদের দান করব।"

মূলত এ দু'টি অর্থেই এই আয়াতকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে:

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾

"আর আমার বান্দারা যখন আপনার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তখন (বলুন) নিশ্চয়ই আমি কাছেই আছি। যখন কোনো প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দিই।"[৫৩] সঠিক কথা হল, দু'আ উভয় প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে।[৫৪]

❖ দু'আর হুকুম :

ফকীহগণ দু'আর বিধান সম্পর্কে মতানৈক্য করেছেন। এটি কি واجب (ওয়াজিব) নাকি مستحب (মুস্তাহাব)? এ বিষয়ে দুটি মত রয়েছে। যথা-

প্রথম মত : এটি মুস্তাহাব। ইমাম নববী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন :

"জেনে রাখো! নির্বাচিত মত, যা ফকিহ, মুহাদ্দিস এবং পূর্বসূরী ও পরবর্তী সকল সম্প্রদায়ের অধিকাংশ আলেম মেনে নিয়েছেন, তা হল দু'আ করা মুস্তাহাব।"[৫৫]

দ্বিতীয় মত : এটি ওয়াজিব। তারা দলীল হিসেবে আল্লাহর এই বাণী উল্লেখ করেছেন,

﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾

"আর তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন : আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। যারা আমার ইবাদত থেকে অহংকার করে, তারা অপমানিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"[৫৬] ইমাম শাওকানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন : "এটি প্রমাণ করে যে, বান্দার জন্য তার প্রতিপালককে ডাকা পরিত্যাগ করা অহংকারের অংশ। আর তা থেকে বেঁচে থাকা নিঃসন্দেহে ওয়াজিব।"[৫৭]

এছাড়াও তারা আল্লাহর এই বাণীকে দলীল হিসেবে উল্লেখ করেছেন,

﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾

"কে সেই সত্তা, যে অসহায়ের ডাক শুনে তা কবুল করে, কষ্ট দূর করে এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানায়? আল্লাহ ছাড়া কি আর কোনো ইলাহ আছে? তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ কর।"[৫৮] এখানে استفهام

---

[৪৮] মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১৫/১১।
[৪৯] মাজমূউল ফাতাওয়া ১০/২৩৭-২৩৮।
[৫০] কাওয়ায়েদুল হিসান লি তাফসীরিল কুরআন, পৃ. ১২৭।
[৫১] তথ্যসূত্র : তাফসির ও ফিকহ বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ।
[৫২] সূরা গাফির ৬০।
[৫৩] সূরা আল-বাকারা আয়াত : ১৮৬।
[৫৪] জালাউল আফহাম, পৃ. ১৫৫-১৫৬), এবং মাজমূউল ফাতাওয়া ১০/২৩৭-২৩৮।
[৫৫] আল আযকার, পৃ. ৩৯৫।
[৫৬] সূরা গাফির আয়াত : ৬০।
[৫৭] তুহফাতুয যাকিরীন, পৃ. ৩৬।
[৫৮] সূরা আন-নামল আয়াত : ৬২।

(প্রশ্ন) করা হয়েছে, যা সেই ব্যক্তির নিন্দা ও তিরস্কারের জন্য, যে তার প্রতিপালককে ডাকতে অবহেলা করে।[৫৯]

এছাড়াও, আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. "যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে কিছু চায় না, আল্লাহ তার ওপর রাগান্বিত হন।"[৬০]

এটি প্রমাণ করে যে, বান্দার জন্য তার প্রতিপালকের নিকট দু'আ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। আর এটি সর্বশ্রেষ্ঠ আবশ্যিক বিষয়গুলোর মধ্যে একটি; কারণ আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে এমন বিষয় থেকে বিরত থাকা অবশ্যকর্তব্য হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই।[৬১] যুবাইদী বলেন: 'কতিপয় ইমাম বলেছেন : এটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা আবশ্যক।'[৬২]

বিশুদ্ধ মত : দু'আ সাধারণভাবে পাঁচটি বিধানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। যেমন, সূরা ফাতিহায় বর্ণিত দু'আটি ওয়াজিব, কারণ এটি সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম এবং সর্বাধিক প্রজ্ঞাপূর্ণ দু'আ।[৬৩] তেমনিভাবে তাওবাও আবশ্যক, কেননা এটি আল্লাহর কাছে পাপসমূহের ক্ষমা প্রার্থনার নাম, আর সমগ্র উম্মত এর বাধ্যতামূলক হওয়ার বিষয়ে একমত।[৬৪]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, "আমাদের শরী'আতের সাধারণ নীতি হলো, যদি কোনো দু'আ ওয়াজিব বা মুস্তাহাব হয়, তবে তা উত্তম এবং দু'আ করা ব্যক্তিকে সওয়াব দেওয়া হবে। যদি তা হারাম হয়, যেমন অন্যায়ভাবে রক্তপাতের জন্য দু'আ করা, তবে তা পাপ ও অবাধ্যতা। যদি তা মাকরূহ হয়, তবে তা দু'আ করা ব্যক্তির মর্যাদা হ্রাস করে। আর যদি তা মুবাহ হয়, তবে এতে কোনো সওয়াব বা গুনাহ নেই"।[৬৫]

❖ দু'আর ফযীলত :

ইবাদতের আসল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর কাছে বিনয় প্রকাশ করা। আর দু'আর মাধ্যমে বান্দা সরাসরি তার প্রয়োজন প্রকাশ করে। দু'আর অসংখ্য ফযীলত রয়েছে, যা কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এর মধ্যে কয়েকটি হল :

১. দু'আ হলো ইবাদত :

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন,

﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾

"তোমাদের রব বলেছেন, 'আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। যারা আমার ইবাদত থেকে অহংকার করে, তারা জাহান্নামে লাঞ্ছিত হয়ে প্রবেশ করবে।"[৬৬]

নু'মান ইবনে বশির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, الدعاء هو العبادة "দু'আই ইবাদত।"এরপর তিনি উপরোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন।[৬৭]

২. দু'আ আল্লাহর কাছে সর্বাধিক সম্মানিত বিষয় :

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء "আল্লাহর কাছে দু'আর চেয়ে অধিক সম্মানিত কিছু নেই।"[৬৮]

৩. আল্লাহ দু'আকারীর ব্যাপারে নৈকট্য ও দু'আ কবুলের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন :

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

﴿وإذا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾

"যখন আমার বান্দারা আপনার কাছে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে, তখন (বলুন) আমি তো নিকটবর্তী। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনায় সাড়া দেই, যখন সে আমাকে ডাকে। সুতরাং তারা যেন আমার আহ্বানে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে, যাতে তারা সঠিক পথে চলতে পারে।"[৬৯]

৪. দু'আ তাক্বদীর পরিবর্তন করে :

[৫৯] তুহফাতুয যাকিরীন, পৃ. ৩৬।
[৬০] তিরমিযী হা : ৩৩৭৩;
আদাবুল মুফরাদ হা : ৬৫৮; আলবানী সহীহ বলেছেন।
[৬১] তুহফাতুয যাকিরীন, আশ শাওকানী,পৃ. ৩৬।
[৬২] ইতহাফুস সাদাতুল মুত্তাকীন ৫/৩০।
[৬৩] মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১৪/৩২০।
[৬৪] জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, ইবনে রজব ১/৪২৬।
[৬৫] মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৮/৩৩৬।
[৬৬] সূরা গাফির আয়াত : ৬০।
[৬৭] আবু দাউদ হা : ১৪৭৯; তিরমিযী হা : ৩৩৭২, সনদ হাসান।
[৬৮] তিরমিযী হা : ৩৩৭০; ইবনে মাজাহ হা : ৩৮২৯;
আলবানী সহীহ বলেছেন।
[৬৯] সূরা আল-বাকারা আয়াত : ১৮৬।

সালমান رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন,

لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر

"তাক্বদীর পরিবর্তন করতে পারে শুধু দু'আ, আর আয়ু বৃদ্ধি করে শুধু সৎকর্ম।"[৭০]

৫. বান্দা আল্লাহকে অধিক ডাকুক, এটাই আল্লাহর চাওয়া : আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন : إنه من لم يسأل الله يغضب عليه "যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে কিছু চায় না, আল্লাহ তার ওপর রাগান্বিত হন।"[৭১]

❖ **দু'আর শর্তাবলি :**

১. ইখলাছ বা একনিষ্ঠতা : আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ "তোমরা আল্লাহকে ডেকো একনিষ্ঠভাবে তাঁর জন্য দীন কায়েম রেখে, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।"[৭২] তিনি আরো বলেন,

﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

'তিনিই চিরঞ্জীব, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং একনিষ্ঠভাবে তাঁকে ডাকো। সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।"[৭৩]

২. খাবার, পানীয় ও পোশাক হালাল হওয়া : আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন,

يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك ؟

"যে দীর্ঘ সফর করে, চুল এলোমেলো ও ধূলিমলিন অবস্থায় থাকে, উভয় হাত আকাশের দিকে তুলে বলে : "হে রব! হে রব!" অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পোশাক হারাম এবং সে হারাম দ্বারা লালিত-পালিত, তাহলে কীভাবে তার দু'আ কবুল হবে? "[৭৪]

৩. দু'আ কবুল হওয়ার বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস ও একাগ্রতা : আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه

'তোমরা আল্লাহর কাছে দু'আ করো দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে যে, তিনি কবুল করবেন। জেনে রেখো, উদাসীন ও অন্যমনস্ক অন্তরের দু'আ আল্লাহ কবুল করেন না।'[৭৫]

৪. দু'আর মধ্যে দৃঢ় সংকল্প রাখা : আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন :

إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له

'তোমাদের কেউ যখন দু'আ করে, তখন সে যেন দৃঢ়ভাবে চায় এবং যেন এভাবে না বলে : হে আল্লাহ! যদি আপনি চান, তবে আমাকে দান করুন। কেননা আল্লাহকে কেউ বাধ্য করতে পারে না।'[৭৬]

৫. পাপ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য দু'আ না করা : আবু সাঈদ খুদরী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم، ولا قطيعة رحم، إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، قالوا : إذا نكثر ، قال : والله أكثر

'কোনো মুসলিম যদি এমন দু'আ না করে, যাতে পাপ নেই এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার আবেদন নেই, তবে আল্লাহ তাকে তিনটির একটিতে সম্মানিত করবেন- ১. হয়তো তার দু'আ তৎক্ষণাৎ কবুল করবেন, ২. অথবা তা তার জন্য আখিরাতের জন্য জমা রাখবেন, ৩. কিংবা তার অনুরূপ কোনো অনিষ্ট দূর করে দেবেন। সাহাবীরা বললেন : তাহলে আমরা বেশি বেশি দু'আ করব। রাসূল ﷺ বললেন : আল্লাহ আরো বেশি দানশীল।'[৭৭] চলবে ইনশাআল্লাহ

[৭০] *তিরমিযী হা : ২১৩৯; সিলসিলা সহীহা, ১/১৫৪; আলবানী সহীহ বলেছেন।*
[৭১] *তিরমিযী হা : ৩৩৭৩; আদাবুল মুফরাদ হা : ৬৫৮; আলবানী সহীহ বলেছেন।*
[৭২] *সূরা গাফির আয়াত : ১৪।*
[৭৩] *সূরা আল-আন'আম আয়াত : ১৬৫।*
[৭৪] *সহীহ মুসলিম হা : ১০১৫।*
[৭৫] *তিরমিযী হা : ৩৪৭৯; সহীহ আলজামি, ২/২৪৫; আলবানী সহীহ বলেছেন।*
[৭৬] *সহীহ বুখারী হা : ৬৩৩৮ ও সহীহ মুসলিম হা : ২৬৭৮।*
[৭৭] *আহমদ, মুসনাদ ১৭/২১৩-২১৪; সনদ সহীহ।*

ঈমানী চেতনা

আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন*

মানব জীবনের পথযাত্রা কখনো শান্তির, কখনো সংকটের। এই পথযাত্রায় অন্তরের আলোকিত চেতনা না থাকলে মানুষ সহজেই বিভ্রান্তি, অনৈতিকতা এবং আত্মবিস্মৃতির খাড়িতে হারিয়ে যায়। ইসলামের শিক্ষা আমাদের শেখায় যে, ঈমান কেবল বিশ্বাস নয়, এটি জীবনের প্রতিটি দিককে আলোকিত করার শক্তি।

ঈমানী চেতনা বলতে বোঝায়, একটি অন্তর্দৃষ্টি, যা মানুষের হৃদয়কে সত্য, ন্যায় ও ধার্মিকতার দিকে পরিচালিত করে। এটি সেই শক্তি, যা মানুষের চরিত্রকে পূর্ণতা দেয়, মনকে স্থির করে এবং সমাজে শান্তি ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করে।

“যেমন সূর্যের আলো অন্ধকার রাতকে দূর করে, তেমনি ঈমানী চেতনার আলো মানুষের অন্তরের অন্ধকার মুছে দেয়। এই আলোকে ধরলেই ব্যক্তি বিচলিত হয় না, বিভ্রান্ত হয় না, বরং প্রতিটি প্রতিকূলতার মাঝে শক্তি ও সাহস খুঁজে পায়।”

ইসলামের ইতিহাস সাক্ষী, যেখানে মানুষ ঈমানের আলো ধরে চলেছে, সেখানে তারা বিপদকে সাহসের সোপান হিসেবে দেখেছে। নবীজি ﷺ এবং সাহাবাগণ শুধুমাত্র তাদের বিশ্বাসের শক্তি দিয়ে সমাজে ন্যায়, সৌন্দর্য ও আলোর ছোঁয়া ছড়িয়েছেন। আর যেখানে ঈমান হারিয়ে গেছে, সেখানে এসেছে বিভ্রান্তি, শিরক, বিদ‘আত ও অসহিষ্ণুতা। যেমন, “যে অন্তরে ঈমানের আলো জ্বলে, তার চোখে বিভ্রান্তি ঢুকতে পারে না, তার হৃদয়ে ভ্রান্তির অন্ধকার বিস্তার পায় না, আর তার পায়ে সত্য ও ন্যায়ের পথে দৃঢ়তা থাকে।”

❖ **ঈমানী শক্তির ভিত্তি :** কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে একটি পর্যালোচনা।ইসলামে ঈমান বা বিশ্বাস হলো মুমিন জীবনের সবচেয়ে শক্তিশালী ভিত্তি। এটি শুধু একটি মৌখিক স্বীকৃতি নয়, বরং এমন এক গভীর আত্মিক শক্তি যা মানুষকে জীবনের সকল প্রতিকূলতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সাহস জোগায়। ঈমানী শক্তির মূল ভিত্তি হলো আল্লাহর প্রতি অবিচল বিশ্বাস, যা কুরআন ও সুন্নাহর গভীর জ্ঞানের মাধ্যমে সুদৃঢ় হয়। এই প্রবন্ধের লক্ষ্য হলো ঈমানী শক্তির উৎস, এর গুরুত্ব এবং এর মূল স্তম্ভগুলো নিয়ে আলোচনা করা, যেখানে আমরা কোরআন ও হাদীসের কিছু দলিল তুলে ধরব।

❖ **আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস (তাওহীদ) :** ঈমানের প্রথম এবং প্রধান ভিত্তি হলো আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস বা তাওহীদ। আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে বলেন :

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

“বলুন, তিনিই আল্লাহ, এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো ওপর নির্ভরশীল নন, সবাই তাঁর ওপর নির্ভরশীল।”

তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি। আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।[৭৮]

এ আয়াতে আল্লাহ নিজেকে একক, অমুখাপেক্ষী এবং অতুলনীয় সত্তা হিসেবে পরিচয় করিয়েছেন। এ বিশ্বাস একজন মুমিনকে সব ধরনের ভয়, হতাশা এবং দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করে। যখন একজন মানুষ বিশ্বাস করে যে, তার জীবনের সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছাধীন, তখন সে আল্লাহর ওপর সম্পূর্ণ ভরসা করতে পারে। মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস কেবল একটি বিষয় নয়, বরং তা এক গভীর অনুভূতি, যা মানব জীবনের প্রতিটি অংশে মিশে আছে। এ বিশ্বাস হলো এক অদেখা সত্তার প্রতি অন্তরের নিবিড় আত্মসমর্পণ। এটি কেবল তর্কের বিষয় নয়, বরং হৃদয়ের স্পন্দন, যা আমাদের অস্তিত্বের প্রতিটি পরতে অনুরণিত হয়। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস যেন এক মহাকাশচারী নাবিকের স্থির ধ্রুবতারা। জীবনের চঞ্চল স্রোতে, প্রতিকূলতার ঝড়ে যখন দিকভ্রান্ত হই, তখন এ বিশ্বাসই আমাদের সঠিক পথের দিশা দেখায়। এটি এক নির্ভার আশ্রয়, যেখানে সব ক্লান্তি, সব হতাশা জমা করে আমরা প্রশান্তি লাভ করি। এ বিশ্বাস হলো এক নীরব কথোপকথন। এটি এমন এক সখ্য, যেখানে কোনো শব্দ প্রয়োজন হয় না। কেবল অন্তর থেকেই সৃষ্টিকর্তার অসীম ভালোবাসা ও করুণা অনুভব করা যায়। প্রতিটি সূর্যোদয়ে, প্রতিটি পাখির কলরবে, রাতের স্নিগ্ধ আঁধারে তাঁর

* পাঁচরুখী, আড়াই হাজার, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।

[৭৮] সূরা ইখলাস আয়াত : ১-৪।

সূচিপত্র

অস্তিত্বের প্রমাণ আমরা খুঁজে পাই। মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস হলো এক অদৃশ্য শক্তি, যা আমাদের ভালো কাজের প্রেরণ জোগায়। তা আমাদের অন্তরে এমন এক আলো জ্বালায়, যা দিয়ে আমরা নিজেদের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করি এবং তাঁর বিশালত্বের সামনে মাথা নত করি। এ বিশ্বাস আমাদেরকে অহংকার থেকে দূরে রাখে এবং বিনয় ও কৃতজ্ঞতার চাদরে আবৃত করে। এটি জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা দুঃখের সময়ে সান্ত্বনা দেয় এবং সুখের সময়ে কৃতজ্ঞ হতে শেখায়। এ বিশ্বাস যেন এক নদীর মতো, যা আমাদের জীবনকে বয়ে নিয়ে যায় এক অনন্ত সমুদ্রের দিকে, যেখানে রয়েছে পরম শান্তি ও মুক্তি।

জিবরাঈলের প্রসিদ্ধ হাদীস :

أن جبريل عليه السلام أتى النبي ﷺ فسأله عن الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.

“জিবরাঈল আলাইহিস সালাম নবী ﷺ-এর কাছে এসে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, ঈমান হলো এই যে, তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাকুল, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং শেষ দিবসের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তাকদিরের ভালো-মন্দের ওপর ঈমান আনবে।”[৭৯]

❖ **ফেরেশতাদের ওপর বিশ্বাস :** ইসলামে ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বিশ্বাস অনুযায়ী, ফেরেশতারা আল্লাহর এমন এক সৃষ্টি, যারা মানুষের মতো খাদ্য, পানীয়, ঘুম বা বংশবৃদ্ধির প্রয়োজন অনুভব করেন না। তারা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর আনুগত্যের জন্য নিবেদিত। তাদের প্রধান কাজ হলো আল্লাহর বিভিন্ন আদেশ ও নির্দেশ পালন করা।

তাদের কিছু প্রধান কাজ হলো :

❖ **ওহী বহন :** জিবরাঈল আলাইহিস সালাম নবী-রাসূলদের কাছে আল্লাহর বাণী (ওহী) পৌঁছে দিতেন।

❖ **সৃষ্টিকুলের তত্ত্বাবধান :** কিছু ফেরেশতা বৃষ্টির ব্যবস্থাপনা, বাতাস পরিচালনা এবং গর্ভের সন্তানকে রূপ দেওয়ার মতো কাজে নিযুক্ত।

❖ **মানুষের কর্ম লিপিবদ্ধকরণ :** প্রতিটি মানুষের সঙ্গে দুজন করে ফেরেশতা থাকেন, যারা তাদের ভালো ও মন্দ কাজগুলো লিপিবদ্ধ করেন।

❖ **রূহ কবজ করা :** মালাকুল মাউত আলাইহিস সালাম ও তাঁর সহকারীরা মানুষের জীবন কেড়ে নেওয়ার দায়িত্বে রয়েছেন।

❖ **কবর ও আখিরাতের হিসাব :** মুনকার ও নাকীর নামক দু’জন ফেরেশতা কবরে মানুষকে প্রশ্ন করেন। ইত্যাদি কাজে তারা নিয়মিত নিয়োজিত। মহান আল্লাহ তা‘আলা কুরআনুল কারীমে বলেন,

﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ﴾

“রাসূল ﷺ তাঁর প্রতি তাঁর রবের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার ওপর ঈমান এনেছেন এবং মুমিনগণও। তাদের প্রত্যেকেই আল্লাহর ওপর, তাঁর ফেরেশতাগণের ওপর, তাঁর কিতাবসমূহের ওপর এবং তাঁর রাসূলগণের ওপর ঈমান এনেছে।”[৮০]

আল্লাহ তা‘আলা অন্য আয়াতে বলেন,

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আসমানসমূহ ও জমিনের স্রষ্টা; যিনি ফেরেশতাদেরকে বার্তাবাহক করেছেন, যাদের আছে দু’টি, তিনটি ও চারটি ডানা। তিনি সৃষ্টির মধ্যে যা চান বৃদ্ধি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।”[৮১]

❖ **আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস :** ঈমানের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হলো আল্লাহর প্রেরিত কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস এবং তাঁর রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ ووَرُسُلِهِ﴾

“রাসূল ﷺ তাঁর রবের পক্ষ থেকে যা কিছু তাঁর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছেন, এবং মুমিনরাও ঈমান এনেছে। তারা সবাই আল্লাহর ওপর, তাঁর ফেরেশতাগণের ওপর, তাঁর কিতাবসমূহের ওপর এবং তাঁর রাসূলগণের ওপর ঈমান এনেছে।”[৮২]

---

[৭৯] *সহীহ মুসলিম হা : ৮, সহীহ বুখারী হা : ৫০।*

[৮০] *সূরা আল-বাকারা আয়াত ২৮৫।*

[৮১] *সূরা ফাতির আয়াত : ১।*

[৮২] *সূরা আল-বাকারা আয়াত : ২৮৫।*

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, মুমিন ব্যক্তি রাসূল ﷺ এবং আল্লাহর কিতাবগুলোর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করবে। কোরআন ও সুন্নাহ হলো সেই আলোকবর্তিকা যা মুমিনকে সঠিক পথ দেখায়। এর মাধ্যমে মানুষ জানতে পারে তার করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়গুলো। আল্লাহর কিতাব হলো সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে মানুষের জন্য পাঠানো এক প্রেমময় বার্তা। এটি যেন সেই নদীর মতো, যা শুকিয়ে যাওয়া জমিতে নতুন প্রাণের সঞ্চার করে। এই কিতাব জ্ঞান ও হেদায়েতের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। এর প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাক্য যেন আল্লাহর ভালোবাসার এক স্পর্শ, যা আমাদের অন্তরকে শীতল করে। এ কিতাব কেবল পড়ার জন্য নয়, বরং জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের জন্য এক পরিপূর্ণ দিকনির্দেশনা। আর রসূলদের প্রতি বিশ্বাস হলো- তাঁরা হলেন, আল্লাহর রাসূল সেই প্রেমময় বার্তার বাস্তব রূপ। তিনি যেন এক সুবাসিত ফুল, যা তার সৌরভ দিয়ে পুরো পৃথিবীকে সুবাসিত করে। তাঁর জীবন ছিল কিতাবের জীবন্ত ব্যাখ্যা। তিনি ছিলেন আমাদের জন্য এক নিখুঁত আদর্শ, ভালোবাসা ও করুণার এক অনন্য উদাহরণ। রাসূলের প্রতি বিশ্বাস হলো- তাঁর প্রতিটি কথাকে সত্য বলে মেনে নেওয়া এবং তাঁর দেখানো পথে চলা। এককথায়, আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস হলো আল্লাহর প্রতি আমাদের আনুগত্য ও ভালোবাসার এক পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ। এই দুটি জিনিস একে অপরের পরিপূরক। কিতাব হলো ঐশী বিধান, আর রাসূল হলেন সেই বিধানের বাস্তবায়নকারী। বিশ্বাসী হৃদয়ে এই দুটি সত্তা অবিচ্ছেদ্য, যা আমাদের জীবনকে এক নতুন অর্থ ও পরিপূর্ণতা দান করে। নয়, বরং এটি কর্মের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

❖ **পরকালের প্রতি বিশ্বাস :** পরকালের প্রতি বিশ্বাস হলো এক গভীর অনুভূতি, যা মানব জীবনকে এক নতুন অর্থ ও গভীরতা দান করে। এটি কেবল একটি ধারণাই নয়, বরং আমাদের কর্ম ও চিন্তার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।”[৮৩]

এক অনন্ত যাত্রার প্রস্তুতি, এ পার্থিব জীবন যেন এক ক্ষণস্থায়ী সরাইখানা, যেখানে আমরা কিছু সময়ের জন্য আশ্রয় নিয়েছি। কিন্তু পরকাল হলো সেই অনন্ত বাড়ি, যেখানে আমাদের চিরস্থায়ী ঠিকানা। আমাদের এ ক্ষণস্থায়ী জীবন হলো সেই অনন্ত যাত্রার প্রস্তুতি। এখানে আমাদের প্রতিটি কাজ, প্রতিটি কথা, এমনকি মনের প্রতিটি ভাবনাও সেই যাত্রার পাথেয় হিসেবে জমা হচ্ছে।

সুবিচার ও প্রতিদান, এ পৃথিবীতে অনেক সময় ভালো মানুষ কষ্ট পায় এবং খারাপ মানুষ সুবিধা ভোগ করে। কিন্তু পরকালের প্রতি বিশ্বাস আমাদের এ আশা দেয় যে, সেখানে কোনো অবিচার থাকবে না। সেখানে ন্যায়বিচারের এক পরিপূর্ণ আদালত বসবে, যেখানে আমাদের জীবনের প্রতিটি কর্মের হিসাব নেওয়া হবে। আমাদের ভালো কাজের জন্য থাকবে অনন্ত শান্তি ও সুখের বাগান, জান্নাত, আর মন্দ কাজের জন্য থাকবে যন্ত্রণার স্থান, জাহান্নাম। এ বিশ্বাস আমাদেরকে সৎ পথে চলতে এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে উৎসাহিত করে। অন্তরের প্রশান্তি, পরকালের প্রতি বিশ্বাস আমাদের অন্তরে এক অদ্ভুত শান্তি এনে দেয়। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, এ জীবনের দুঃখ, কষ্ট বা সীমাবদ্ধতাগুলো সাময়িক। সবকিছুর পর এক নতুন জীবন অপেক্ষা করছে, যেখানে কোনো দুঃখ বা ক্লান্তি থাকবে না। এটি হলো জীবনের চূড়ান্ত মুক্তি ও পরম শান্তির এক প্রতিশ্রুতি, যা আমাদের প্রতিদিনের জীবনকে নতুন করে সাজাতে অনুপ্রাণিত করে। এই বিশ্বাস মানুষকে হতাশা থেকে বাঁচায় এবং জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে পেতে সাহায্য করে। এটি আমাদেরকে এমন এক অনন্তকালের স্বপ্ন দেখায়, যেখানে আল্লাহর করুণা ও ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।

❖ **তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস :** তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস হলো ঈমানের ছয়টি স্তম্ভের অন্যতম। এটি কেবল একটি বিশ্বাসই নয়, বরং জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে অর্থবহ করে তোলে এমন এক গভীর উপলব্ধি। এটি এমন এক দার্শনিক ভিত্তি, যা মানুষকে সব পরিস্থিতিতে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ হতে শেখায়। তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস যেন এক মহাকাব্যিক চিত্রপট। এ মহাবিশ্বে সবকিছুই যেন এক সুনিপুণ শিল্পীর তুলিতে আঁকা এক বিশাল ক্যানভাস। সেখানে আমাদের জীবন হলো সেই ক্যানভাসের একটি ক্ষুদ্রতম অংশ। শিল্পীর তুলি কীভাবে চলবে, কোন রং

[৮৩] *সূরা আল-বাকারা আয়াত : ৬২।*

কোথায় বসবে সবই তিনি জানেন। আমরা দেখতে পাই শুধু আজকের ছবিটি, কিন্তু শিল্পী জানেন পুরো ক্যানভাসে কী চিত্র ফুটে উঠবে। এ বিশ্বাস আমাদেরকে শেখায়, জীবনের পথ মসৃণ হোক বা বন্ধুর, আনন্দ আসুক বা দুঃখ-সবই সেই মহান শিল্পীর পরিকল্পনা। তাই ভালো কিছু হলে আমরা অহংকারী হই না, বরং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। আর খারাপ কিছু হলে ভেঙে পড়ি না, কারণ আমরা জানি-এটাও তাঁরই ইশারায় হয়েছে এবং এর পেছনে কোনো না কোনো কল্যাণ নিহিত আছে। এ বিশ্বাস হলো এক নিরাময়কারী মলমের মতো, যা আমাদের হতাশা ও দুঃখের ক্ষতে প্রশান্তি বুলিয়ে দেয়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾

“নিশ্চয় আমি সবকিছুই একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অনুযায়ী সৃষ্টি করেছি।”[৮৪]

এ আয়াতে আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, সবকিছু একটি নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী চলে। এটি মানব জীবনের প্রতিটি ছোট-বড় বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। হাদীসে এসেছে,

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي ﷺ يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف

“ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পেছনে ছিলাম। তিনি বললেন : হে বালক! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিক্ষা দিচ্ছি : আল্লাহর অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখবে, তাহলে আল্লাহও তোমার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। আল্লাহর অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখবে, তাহলে তাঁকে তোমার সামনে পাবে। যখন কোনো কিছু চাইবে, তখন আল্লাহর কাছেই চাইবে। যখন সাহায্য চাইবে, তখন আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে। জেনে রেখো, যদি সমগ্র জাতি একত্রিত হয়ে তোমার কোনো উপকার করতে চায়, তবে আল্লাহ তোমার জন্য যতটুকু লিখে রেখেছেন, তার অতিরিক্ত তারা তোমার কোনো উপকার করতে পারবে না। আর যদি তারা তোমার কোনো ক্ষতি করতে চায়, তবে আল্লাহ তোমার জন্য যতটুকু লিখে রেখেছেন, তার অতিরিক্ত তারা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং লিখিত কাগজ শুকিয়ে গেছে।”[৮৫]

এ হাদীসটি তাকদিরের প্রতি বিশ্বাসের গভীরতা ব্যাখ্যা করে। এটি প্রমাণ করে যে, মানুষের জীবনে যা কিছু ঘটে, তা সবই পূর্বনির্ধারিত। এর মাধ্যমে একজন বিশ্বাসী অন্তর থেকে আল্লাহর ওপর ভরসা করতে শেখে এবং জীবনের সব উত্থান-পতনকে শান্ত মনে গ্রহণ করে। হাদীসটি শুধু তাকদিরের প্রতি বিশ্বাসের গভীরতাই নয়, বরং আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল বা নির্ভরতার এক অসাধারণ দৃষ্টান্তও তুলে ধরে। এটি শেখায় যে, সবকিছুর ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতে। তাই কোনো উপকার বা ক্ষতির জন্য মানুষের ওপর নির্ভর না করে সরাসরি আল্লাহর কাছেই চাইতে হয়। হাদীসের শেষাংশ, “কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং লিখিত কাগজ শুকিয়ে গেছে”, এটি বোঝায় যে' তাকদির চূড়ান্ত এবং অপরিবর্তনীয়। এ জ্ঞান একজন বিশ্বাসীকে জীবনের সব পরিস্থিতিতে মানসিক প্রশান্তি এবং দৃঢ়তা দান করে।

ঈমানী চেতনা হলো সেই অগ্নিশিখা, যা আমাদের অন্তরকে সর্বদা আলোকিত রাখে। এটি আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয়, আমরা আল্লাহর বান্দা, তাঁর রহমতের আশায় এবং তাঁর ভালোবাসা লাভের জন্য সর্বদা সচেষ্ট। এ চেতনা আমাদেরকে সৎ পথে পরিচালিত করে, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে এবং সব পরিস্থিতিতে আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা রাখতে শেখায়। ঈমানের চেতনা এ এক আলোকবর্তিকা, যা আমাদের অন্তরের আঁধার দূর করে। এটি এক নীরব প্রেম, যা আমাদেরকে জাগতিক সবকিছুর ঊর্ধ্বে এক সত্ত্বার সঙ্গে একাত্ম করে। এ যেন সেই নদীর মতো, যা আমাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ করে এবং অনন্ত শান্তির দিকে প্রবাহিত করে। ঈমানী শক্তি হলো এক অদম্য সাহস, যা আমাদেরকে পরাজয়ের মুহূর্তেও ভেঙে পড়তে দেয় না। এটি আমাদের হৃদয়ে এমন এক আশা জাগায়, যা সব প্রতিকূলতাকে জয় করতে শেখায়। এ চেতনা আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে ইবাদতে পরিণত করে এবং আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করে।❑❑

---

[৮৪] *সূরা ক্বামার আয়াত : ৪৯।*

[৮৫] *সুনানে তিরমিযী হা : ২৫১৬।*

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগের অপরিহার্যতা

মোহাম্মদ মাযহারুল ইসলাম *

প্রারম্ভিকতা :

শিক্ষা মানুষের অমূল্য সম্পদ। শিক্ষা মানুষের প্রাণশক্তি, জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা জাতির উত্থান পতনের মূল কাঠি ও আলোকিত জীবনের পরশমণি। শিক্ষার আলোয় কিংবা স্বংস্পর্শে মানুষের মনুষ্যত্ব বোধের পূর্ণতা পায়, সমৃদ্ধি লাভ করে, জাতি প্রগতির পথে অগ্রসর হয়। দুনিয়ার বুকে আধিপত্য বিস্তার করতে সচেষ্ট হয়। শিক্ষা ই শক্তি, শিক্ষাই উন্নতির মূলমন্ত্র। শিক্ষাবিহীন একটি পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতি অন্ধকারের অতল গহ্বরে নিপতিত হওয়ার নামান্তর। সুতরাং শিক্ষার মানোন্নয়নে ও নৈতিক শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতির ভাগ্যাকাশে কল্যাণ নিহিত রয়েছে। নচেৎ জাতির উত্থান পতনের ঘটনা প্রবাহে কত জাতির করুণ পরিণতি হয়েছে তা খোদ ইতিহাস'ই সাক্ষী।

ইংরেজ আমলে ভারতীয় উপমহাদেশের ধর্মীয় শিক্ষার সংলাপ :

ভারত বর্ষের সর্বশেষ শাসক ছিল মোঘল বংশের সম্রাটগণ। শিক্ষার উন্নতি মূলত সবচেয়ে বেশি হয়েছিল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়। তিনি তৎকালীন আলেম ওলামা, মক্তবের শিক্ষকদের মাসিক ভাতা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। সেই সাথে তিনি তাদের সম্মানসূচক জীবন-জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে তাদেরকে হাদীয়া তোহফা দেন। ১৭৫৭ সালে সর্বপ্রথম ইংরেজরা ভারতীয় উপমহাদেশ দখল করে। ১৮০৩ সালে ইংরেজরা রাজধানী দিল্লি দখল করে। ইংরেজদের গোটা মুসলিম ভারত দখল করতে সময় লেগেছিল ১০০ বছর। এই সুদীর্ঘ ১০০ বছরের মধ্যে তারা বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্রের কূটচাল চালে। বিশেষত তারা শিক্ষা ক্ষেত্রে নানা ধরনের ষড়যন্ত্রের দুরভিসন্ধির ছক তৈরি করে।

সুলতান মোহাম্মদ বিন তুঘলক (১৩২৫-৫১খ্রিঃ) এর আমলে দিল্লিতে এক হাজার মাদরাসা ছিল। এই সময়ে তাঁরা মাদরাসা শিক্ষাকে মানসম্মত করা, শিক্ষক নিয়োগ, ভাতা ইত্যাদি সুন্দরভাবে পরিচালনা করত। ফলে সেই সময়ের শিক্ষা ব্যবস্থাতে নীতি নৈতিকতার ভিত্তি মজবুত ছিল।

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ম্যাক্স মুলারের শিক্ষা রিপোর্টে বলা হয়েছে- ইংরেজ শাসনের পূর্বে কেবলমাত্র বাংলাদেশেই ৮০ হাজার মক্তব ছিল। তাহলে চিন্তা করুণ! সেই সময়েই ৮০ হাজার মক্তব ছিল। অথচ এখনকার এই আধুনিক যুগে মক্তব শিক্ষাকে গলা টিপে হত্যা করেছে বাস্তববাদী কত দেশি-বিদেশি এনজিও সংস্থামূলক বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই ধারার মূলে কুঠারাঘাত করে ইংরেজ শক্তি। তারা নীতি নৈতিকতা বিমুখ জাতি সৃষ্টিকল্পে ধর্মীয় শিক্ষার বিপরীতে একটি জনমত গড়ে তোলে খুবই কৌশলগতভাবে পরিকল্পনা মাফিক। ফলে ধীরে ধীরে মুসলিম অমুসলিম সবাই তাদের পাতানো ফাঁদে পা ফেলে করুণ পরিণতির শিকার হয়।

আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগের বাস্তবতা :

আমাদের দেশে বিশেষ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষার করুণ চিত্র ক্রমশ ফুটে উঠেছে। দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষার বেহাল দশা। অথচ বাংলাদেশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও এখানে প্রাইমারি বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনো গুরুত্বারোপ এবং ধর্মীয় শিক্ষক পাঠদানের ব্যাপারে নিয়োগের বিষয়টি উচ্চ পদস্থ মহলের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সিলেবাসে তৃতীয় শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণী ইসলাম শিক্ষা সাবজেক্ট রয়েছে, কিন্তু এই সাবজেক্ট পড়ানোর কোনো শিক্ষকের পদ নেই। ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ না থাকার ফলে এই বিষয়ে পাঠদান করছেন বিভিন্ন ধর্মের সাধারণ শিক্ষক। যাদের নিয়োগ হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে।

* *শিক্ষক, রাযিয়া হিফজুল কোরআন মাদ্রাসা এন্ড ইসলামী একাডেমী, সদর, দিনাজপুর। পাঠাগার সম্পাদক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস দিনাজপুর জেলা।*

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২০২৪ সালের তথ্য অনুযায়ী একটি রিপোর্টে উপস্থাপন করা হয়েছে- বাংলাদেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়-এর সংখ্যা ৬৫,৫৬৬টি আর বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৪১৪৯টি। সর্বমোট ৬৯,৭১৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

অনুরূপভাবে গোটা বাংলাদেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সংখ্যা ৩,৮৪,৫১৩ জন।

শিক্ষা ব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো, জাতি গঠনের মূল হাতিয়ার :

বলা হয়, 'Education is the backbone of a nation' অর্থাৎ 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড'। সত্যিই কি শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড? তা বিবেকের কাছে প্রশ্ন! বিজ্ঞজন বলছেন, 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড' নয়; বরং 'সুশিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড'। তা যাই হোক। শিক্ষা নিয়ে আমাদের চিন্তার গভীরতা ও দৃষ্টিভঙ্গি কেমন তা বিবেচনা করা সময়ের যথার্থ দাবি। শিক্ষা নিয়ে বড় বড় পণ্ডিতদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল তা খতিয়ে দেখা দরকার।

কেবল সুশিক্ষাই মানুষকে সকল সৃষ্টি থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও মহীয়ান করে তোলে। নিকষ আঁধার চিরে 'পড়ো'-এর উজ্জ্বল আলোর ফিনকিতে মানুষ গড়ে ওঠে আলোর, সত্যের ও সোনার মানব হয়ে। কবি ওমর খৈয়াম বলেছিলেন, 'সূর্যের আলোতে যেরূপ পৃথিবীর সবকিছু পরিস্ফুটিত হয়ে ভাস্বর হয়, ঠিক তেমনি জ্ঞানের আলোতে জীবনের সকল অন্ধকার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে'।

শিক্ষাই শক্তি, শিক্ষাই বল। উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণের একমাত্র পথ ও পন্থা হলো শিক্ষা। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র নির্বিশেষে শিক্ষাই মানব জীবনকে পরিশীলিত, পরিমার্জিত ও সমাজ পরিবর্তনের এক নির্ভীক চিরজাগ্রত রাহবার তৈরি করে। শিক্ষাবিহীন জাতি বিকলাঙ্গ, অধম, মৃতপ্রায়। শিক্ষাবিহীন জাতি হলো বর্বর, অবিবেচক। শিক্ষাবিহীন মানুষের রূহ তথা আত্মা অসাড় দেহ। মানুষের রূহ ছাড়া যেমন শরীরকে মানুষ বলা যায় না, ঠিক তেমনি শিক্ষা ছাড়া কোনো জীবনকে সার্থক, সফল ও পরিপূর্ণ জীবন বলা যায় না।

এজন্য শিক্ষা নিয়ে ভাবা এবং যথার্থ ভূমিকা পালন করা মানে আদর্শ সমাজ ও জাতি গঠনের মূল হাতিয়ার গ্রহণ করা। শিক্ষার ভিত্তি শুরু হয় পরিবার থেকে। পরিবার শিক্ষিত হলে জাতির সন্তান যারা অনাগত ভবিষ্যতের রূপকার, কাণ্ডারি তারা শিক্ষিত, পরিমার্জিত ও সুশাসনের দেশ ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্র উপহার দিতে সক্ষম হবে। যেখানে নীতি-নৈতিকতা, ইনছাফ প্রতিষ্ঠা থাকবে। যেখানে দুর্নীতির কালো হাত ভাঙা হবে। যেখানে শ্রমিক তার ন্যায্য অধিকার পাবে। এজন্য পরিবার শিক্ষার বুনিয়াদি ও প্রতিষ্ঠিত শক্তি ও সামনে চলার সর্বোত্তম যোগান, অনুপ্রেরণা। শিক্ষাবিদগণ পরিবারকেই শিক্ষার প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান বলে আখ্যায়িত করেছেন। পরিবারের সকল সদস্য শিক্ষিত হলে তো কোনো কথাই নেই। কল্যাণে ভরপুর। তবে সবাই শিক্ষিত হোক বা না হোক 'মা' শিক্ষিত হওয়া মানে শিক্ষিত জাতি পাওয়া। শিশুর শিক্ষার বুনিয়াদি ভিত্তি ও হাতেখড়ি হয় মায়ের কাছেই। এজন্য শিক্ষিত মা একটা পরিবারের জন্য অতীব জরুরি।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো আজকে শিক্ষিত মা যারা তাদের সন্তানকে শিক্ষিত করার ইচ্ছায় দিন-রাত ছুটছে, পড়াচ্ছে অথচ সেই আদরের সন্তানকে সুশিক্ষিত করতে পারছে না। কারণ আজকের তথাকথিত আধুনিক অভিভাবকবৃন্দ, যারা সন্তানকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে, স্বপ্ন দেখায়- সন্তানকে শিশু অবস্থায় নৈতিক শিক্ষা তথা রূহের খোরাক দিতে সক্ষম হয়নি। একজন আদর্শ মা-বাবার জন্য অবশ্যকরণীয় হলো, সন্তানকে শিশু অবস্থা থেকেই রূহের উন্নতি সাধনের সবক দেওয়া। অতঃপর সেই বুনিয়াদি শিক্ষা শিশুমনে ভিত্তি করে আগামীর জীবনে চলবে অনায়াসে, সৎ, নিষ্ঠাবান ও নির্ভীক আদর্শ নাগরিক হিসেবে। শিক্ষার তথা পরিবারের প্রাথমিক পর্যায়ে এটাই বড় দায়িত্ব ও কর্তব্য।

সুধী পাঠক! আমাদের বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার চারটি স্তর বিদ্যমান- (১) প্রাথমিক, (২) মাধ্যমিক, (৩) উচ্চ মাধ্যমিক ও (৪) উচ্চ শিক্ষা।

প্রাথমিক শিক্ষা দিয়েই শুরু হয় আমাদের শিক্ষা জীবনের যাত্রা। একটা শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো হার্ট। হার্ট ছাড়া দেহের যেমন মূল্য থাকে না, ঠিক প্রাথমিক শিক্ষা হার্ট সমতুল্য স্পর্শকাতর। প্রাথমিক শিক্ষাই হলো শিক্ষার ভিত্তি। তাই শিক্ষার এই গোড়ায়

পানি ঢালা উচিত। এর উন্নতি সাধন ও উত্তরোত্তর কল্যাণকল্পে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা করা উচিত।

মনীষীদের বক্তব্য হলো, শৈশবের শিক্ষা পাথরে খোদাই করা ছবি অঙ্কনের মতো স্থায়ী হয়। শিশুমনের নরম যমীনে সুশিক্ষার বীজ রোপণ করা মানে ভবিষ্যতে সৎ ও সাহসী জাতি গঠনের মূল দায়িত্ব পালন করা। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান যে করুণ পরিস্থিতি তা ভাবলেই গা শিউরে ওঠে। তথাকথিত সুশীল বুদ্ধিজীবীরা ছাড়াও ইয়াহূদী-খ্রিষ্টান আর হিন্দুত্ববাদীর আধিপত্যের কারণে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা চরম ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। মূলত ষড়যন্ত্রের বেড়াজালে আবদ্ধ বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষার এই ধারা চলমান থাকলে বেশি দিন লাগবে না, এ দেশ সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে চলে যাবে। এতে জাতির শিক্ষাব্যবস্থা চরম হুমকির সম্মুখীন হবে। ভবিষ্যতে জাতি অকর্মা, অদক্ষ, অযোগ্য ও প্রায় বিকলাঙ্গ জাতি উপহার পাবে। যাদের কোনো উদ্ভাবনী ও সৃষ্টিশীল শক্তি সঞ্চার করবে না। সব মেধাবীকে চালান করে নিয়ে দেশকে করবে মেধাশূন্য। ইতোমধ্যে বিভিন্ন দেশে উচ্চ শিক্ষার নামে মেধা চালান চালু করে রেখেছে। প্রাথমিক শিক্ষাসহ দেশের উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত চলছে ছিনিমিনি খেলা। এই দুরভিসন্ধির সূচনা করেছে খ্রিষ্টানমহল। তারা তাদের ক্ষমতা ও সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখার জন্য এই ষড়যন্ত্র করেছে। শিক্ষাব্যবস্থায় কলকাঠি নেড়ে শিক্ষাকে বিকলাঙ্গ শিক্ষায় পরিণত করে বহুকাল গোলাম বানিয়ে রাখবে বলে তারা গভীর ষড়যন্ত্রের নগ্ন পাঁয়তারা চালায়। ফলে বাংলাদেশের মানুষ নামমাত্র স্বাধীন ভূখণ্ডের মালিক হলেও সর্বক্ষেত্রে তারা পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ- চাই তা হোক রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি। ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে ইংরেজরা লেজ গুটিয়ে চলে যাওয়ার মুহূর্তে লর্ড ম্যাকলের ভাষ্য ছিল, We must at present do our best to from a class who maybe interpreters between us and millions whom we govern a class of person Indian in blood and colour but English in taste in openion in moral and intellect. অর্থাৎ 'বর্তমানে আমাদের সর্বাধিক প্রচেষ্টা করতে হবে এমন এক জাতি সৃষ্টির লক্ষ্যে, যারা আমাদের ও আমাদের শাসিত লক্ষ লক্ষ জনগণের মাঝে দূত হিসেবে কাজ করবে। যারা রক্ত, বর্ণে হবে ভারতীয়। কিন্তু রুচিতে, চিন্তা-চেতনায়, নৈতিকতা ও বুদ্ধিবৃত্তিতে হবে ইংরেজ'।

যার ফলশ্রুতিতে আমাদের বাঙালি সমাজ ইংরেজদের গোলামীর শিকার। ইংরেজরা মূলত শিকলে, শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে গোলামী করাতে চায়নি। কারণ এই পদ্ধতিতে যে কেউ গোলামী করতে বাধ্য। তাই তারা বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই করে ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় গোলামী জীবনযাপন করাতে বাধ্য করে। যা আমাদের বাঙালি সমাজ একটুও অনুধাবন করে না।

ব্রিটিশ মন্ত্রী গ্লাডস্টোন বলেছিল, So long as the Muslim have the Qur'an we shall be unable to dominate them. We must either take it from them or make them lose their love at it. অর্থাৎ 'যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিমরা কুরআন আঁকড়ে ধরে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁদেরকে পরাস্ত করা সম্ভব হবে না। তাই তাদের থেকে কুরআন কেড়ে নিতে হবে নতুবা তাদের হৃদয় থেকে কুরআনের ভালোবাসা মুছে দিতে হবে'।

এজন্য তারা বিভিন্ন এনজিও ও সরকারি, আধা-সরকারি, বেসরকারি, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালু করেছে। উদ্দেশ্য ইসলাম শিক্ষাকে মাইনাস করে ধর্মহীন সেক্যুলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠা করে জাতির বুনিয়াদি শিক্ষাকে বিপর্যস্ত করা।

দেশের শিক্ষার মূলধারা হলো প্রাথমিক শিক্ষা। অতঃপর পর্যায়ক্রমে উচ্চ পর্যায়ে শিক্ষা ভাবনা সুদৃঢ় হয়। কিন্তু এই মূলধারার শিক্ষাকে তারা বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে নাস্তিক্যবাদী ও ছবি-মূর্তি আর অশ্লীলতার সুড়সুড়ি দেওয়ার মতো সিলেবাস প্রণয়ন করেছে। যা সত্যিই এই মুসলিম অধ্যুষিত দেশে বিশ্বাস করা কষ্টসাধ্য।

বাংলাদেশের শিক্ষানীতি প্রণয়ন হয়েছে বেশ কয়েকবার। যেমন- (১) ড. কুদরত এ খোদা শিক্ষা কমিটি ১৯৭২-১৯৭৪ সাল। (২) কাজী জাফর আহমেদ শিক্ষা প্রণয়ন কমিটি ১৯৭৮ সাল। (৩) ড. মজিদ খান শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ১৯৮৩ সাল। (৪) ড. মফিজ উদ্দিন শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ১৯৮৭ সাল। (৫) ড. শামসুল হক শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ১৯৯৬ সাল। (৬) অধ্যাপক

সূচিপত্র

মনিরুজ্জামান মিঞা শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি। (৭) অধ্যাপক কবীর চৌধুরী জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ২০১০ সাল।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছে বটে কিন্তু মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজনের সমাধান আজ অবধি হয়নি। শিক্ষানীতির ওপর নির্ভর করে দেশের হালচাল, সততা, উন্নতি, নীতি-নৈতিকতার উজ্জীবিত শক্তি ও সমাজ সংস্কার। অথচ দেশের জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন হয়েছে; প্রণয়ন একবার নয়, একাধিকবার হয়েছে। যেখানে সুশিক্ষার সবক বা নীতিমালা প্রণীত হয়নি, বরং তার জায়গা দখল করেছে কুশিক্ষা। যে শিক্ষা নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দেয়, যে শিক্ষা দেশ ও জাতির দুর্নীতির পথকে উন্মুক্ত করে দেয়, যে শিক্ষা অশ্লীলতার সুড়সুড়ি দেয়, সে শিক্ষা আদৌ কোনো জাতির জাতীয় শিক্ষানীতি হতে পারে? তা বিবেকবানের বিবেচনা করা সময়ের দাবি।

শিক্ষা কারিকুলামের ভিত্তি যত শক্তিশালী হবে জাতির অনাগত ভবিষ্যৎ তত বেশি উন্নতি-অগ্রগতির ভিত্তি মযবূত ও সুদৃঢ় হবে। জাতির শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয় চাহিদা পূরণের দাবি রাখে ও তা পূরণে যথার্থ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু সেই শিক্ষাব্যবস্থা যদি কোনো সাম্রাজ্যবাদী কিংবা ভিন দেশীয় শিক্ষা কারিকুলামের সাজে সজ্জিত করা হয়, তাহলে তা দ্বারা জাতি সত্যিকারার্থে কখনোই সাফল্য ও উন্নতি এবং জাতীয় জীবনে সমাজ সংস্কারের আদৌ কোনো অবদান রাখতে সচেষ্ট হতে পারবে না।

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার মূল উৎস 'অহী'। জাতীয় জীবনের উন্নতিতে একটি সফল ও সার্থক সমাজ জাতিকে উপহার দেওয়ার জন্য ইসলামী শিক্ষা প্রথমেই আত্মা ও রূহের উন্নতি সাধনের জন্য 'পড়ো' শব্দের ওপর ভিত্তি করে তাওহীদের গুরুত্ব, পরকালমুখী জাতি ও এই ঠুনকো দুনিয়ার তুচ্ছতার ওপর আখেরাতকে পেশ করে সৎ-নির্ভীক জাতির প্রত্যাশা করে মূলত ইসলাম শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾

'কোনো ব্যক্তির জন্য সঙ্গত নয় যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, হেকমত ও নবুআত দান করার পর তিনি মানুষকে বলবেন, আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা আমার দাস হয়ে যাও; বরং তিনি বলবেন, তোমরা রব্বানী হয়ে যাও, যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দাও এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন কর'।[৮৬]

আজকের শিক্ষাব্যবস্থার করুণ চিত্র- ধর্মহীন শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করে জাতিকে সীমাহীন ক্ষতির দিকে ঠেলা দেওয়া হচ্ছে, যা সময়েই সকলে বুঝতে পারবে। আল্লাহ, রাসূল ﷺ ও আখেরাতের কথা ভুলিয়ে বস্তুবাদী, ভোগবাদী শিক্ষার প্রতি লোভনীয় করে তোলা হচ্ছে আজকের তথাকথিত আধুনিক শিক্ষায়। সন্তানকে শিশু বয়স থেকেই পুঁজিবাদী অর্থনীতির দৃষ্টান্ত পেশ করছে সূদী, মুনাফাভিত্তিক গণিতের মাধ্যমে। প্রবন্ধ, ছড়া আর গল্পে মিথ্যার জগাখিচুড়ি নিয়ে কচি বয়সের ছাত্র-ছাত্রীর ফ্রেশ মস্তিষ্ককে ধোলাই দিচ্ছে আজকের তথাকথিত আধুনিক শিক্ষা।

মানুষ বানর থেকে সৃষ্টি (Theory of evolution) তথা 'বিবর্তনবাদ মতবাদ' বর্তমান শিক্ষা সিলেবাসের অন্যতম অংশ। চিন্তা করুন, মানুষ বানর থেকে সৃষ্টি। মানুষের আদি পিতা বলতে বানর। আমরা বানরের সন্তান! ভাবতে অবাক লাগে 'ডারউইনের' এই পচা মতবাদ খোদ ইয়াহূদী-খ্রিষ্টান মহলই মানতে পারেনি, বরং এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। অথচ আমরা শিক্ষা সিলেবাসে এমন পচা মতবাদ অন্তর্ভুক্ত করছি, কোন বিবেকে? সত্যিই লজ্জার বিষয়!

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় এমন ষড়যন্ত্র সেটাও সবার জানা। শিক্ষাব্যবস্থায় ধস কি এমনিতেই হবে? যদি তার যথেষ্ট কারণ না থাকে তাহলে তো আর এমনি এমনি ধস নামবে না। জি, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় সিলেবাস নির্ধারণে প্রায় সব সদস্য হিন্দু নিযুক্ত হওয়ায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্র-ছাত্রীর চাহিদা ও আবদার পূরণে যথেষ্ট অভাব, ঘাটতি থেকে যায়। প্রবন্ধ, গল্প, ছড়া ছাড়াও প্রায় সকল পড়াতেই হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি ঐতিহ্যের ছাপ থাকে, ফলে মুসলিম ঘরের ছেলে-মেয়ে নামমাত্র মুসলিম পরিচয় দেয়। আর তার মাথায় ভর করে পাঠ্যবইয়ের সেই হিন্দুয়ানী রসম-

[৮৬] *সূরা আলে-ইমরান আয়াত : ৭৯।*

রেওয়াজ, দেবী-প্রতিমার। মুসলিম কবি-সাহিত্যিকের প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প আজ আর সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। কবি কাজী নজরুল ইসলাম শুধু বাংলার বিদ্রোহী কবির উপাধি পেয়েই ক্ষান্ত, দেশের জাতীয় শিক্ষানীতির সিলেবাসের সীমানায় আসার সুযোগটা তাই বুঝি হারিয়েছে! যেহেতু তিনি কারো তেলবাজি করতে পারেননি তাই পিছনেই থাকতে হয়েছে।

ঈমানবিধ্বংসী বহু ছড়া, কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধে ভরপুর আজকের শিক্ষা সিলেবাস। ফলে একদিকে যেমনিভাবে ঈমান নষ্ট হয়ে কুফরীতে নিমজ্জিত হচ্ছে, ঠিক তেমনিভাবে চারিত্রিক গুণাবলি ও নৈতিক অবক্ষয়ের জন্য যৌন সুড়সুড়ি দেওয়ার মতো গল্প, কবিতা ও উপন্যাসও সিলেবাসে নতুন মাত্রায় যুক্ত আছে। ক্লাসে তো ফ্রি-মিক্সিং আছেই। এমনকি বয়ঃসন্ধিকাল, মাসিক পিরিয়ডসহ অপ্রীতিকর লজ্জাজনক বিষয়গুলোর স্পেশালভাবে সবাই ফ্রি-মাইন্ডে পাঠদান করার জন্য উৎসাহিত করছে। ছেলে-মেয়ের একসাথে শিক্ষায় তরুণ প্রজন্মের বর্তমান জীবনকে উচ্ছৃঙ্খল করে তুলছে। ফলে যৌনচর্চা ও যৌন পরিতৃপ্তির এক অশ্লীল প্রবাহ সৃষ্টি হচ্ছে, যার ফলে নৈতিকতার সব বাঁধন ধুয়ে-মুছে শেষ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। ইংরেজদের এই শিক্ষাধারায় নীতিহীন ও চরিত্রহীন জাতি গঠনের যে শিক্ষা প্রণয়ন করে দিয়েছে তার গোলামী এখন পর্যন্ত চলছে। এই গোলামীর দিন কবে শেষ হবে তা বলা মুশকিল। একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্য বিশেষ করে মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশের জন্য অভিশাপ ছাড়া আর কিছু নয়। দেশের শিক্ষা সমস্যা সম্পর্কে বিজ্ঞজনরা ভালো করেই অবগত আছেন।

বস্তুবাদী, ভোগবাদী শিক্ষা মানুষকে শুধু উদরপূর্তি করতেই বলে। 'খাও দাও, ফূর্তি করো!' সবক দেয়। আর এই সবক পেয়ে দুনিয়াপূজারিরা ন্যায়-অন্যায়ের পথ বাছবিচার না করে দুনিয়া, দুনিয়া বলে ছুটছে। নিজের হাতে সন্তান বাবা-মাকে হত্যা করছে, আগুনে পোড়াচ্ছে, মৃত্যুর সময় জানাযায়ও সন্তানকে পাচ্ছে না। অথচ সেই সন্তানের শিক্ষার জন্য ঐ অভিভাবক কত টাকা-পয়সা আর ত্যাগ বিসর্জন দিয়েছে। পরিশেষে ফলাফল জিরো। কারণ বস্তুবাদী শিক্ষা।

অথচ ধর্মীয় শিক্ষা কখনোই কাউকে অমানুষ বানায় না। বরং অমানুষকে মানুষ বানায়। বাংলাদেশের মানবাধিকার ফাউন্ডেশনের ২০১৫ সালের এক জরিপে জানা যায়, দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কী নাজুক পরিস্থিতি! ঢাকার এক স্কুলের ৯ম শ্রেণির মোট ৩০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ক্লাস রুমে বসে পর্ণোগ্রাফি দেখার সংখ্যা ২৫ জন পাওয়া যায়। পরে প্রধান শিক্ষক মোবাইলগুলো ভেঙে দেন। এই হলো চলমান শিক্ষার অশুভ দর্শন। পাশ্চাত্য সভ্যতা, সংস্কৃতির রঙে রঙিন করতে ব্রিটিশরা এই শিক্ষা দিয়ে গেছে। যেন এই স্বাধীন জাতি স্বাধীনভাবে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে। তারা যেন পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে যুগের পর যুগ। এই মানসে শিক্ষাব্যবস্থায় ছুরি চালিয়েছে। আর তার গোলামী করতে হচ্ছে আজও। শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনতে চাইলে প্রয়োজন আজকে বাংলা সাংবাদিকতার জনক খ্যাত 'মাওলানা আকরাম খাঁ'-এর দৃষ্টি দর্শন।

ইতিহাস বলছে, স্বাধীন ভারতের সর্বপ্রথম শিক্ষামন্ত্রী হন মাওলানা আবুল কালাম আজাদ রহিমাহুল্লাহ। পরে ১৯৪৯ সালে পাকিস্তান শাসনামলে শিক্ষা কমিশন গঠিত হয় মাওলানা আকরাম খাঁর হাতে। ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস সাক্ষী! পাকিস্তান আমলে এটাই ছিল প্রথম শিক্ষা কমিশন।

তাই শিক্ষার এই মূল ধারায় ফিরে না আসা ও যোগ্য ব্যক্তিদের হাতে দায়িত্ব অর্পণ না করা পর্যন্ত বাংলাদেশের শিক্ষায় আমূল পরিবর্তন আশা করা মানে উলুবনে মুক্তো ছড়ানো ছাড়া আর কিছুই না।

আমরা চাই এক উন্নত, মানসম্মত, যোগ্য, সৎ ও দক্ষ, কর্মঠ জাতি গঠনের শিক্ষা সিলেবাস। যার আদলে জাতি ইহকালীন ও পরকালীন সফলতার মানদণ্ড নিরূপণ করতে পারবে। সমাজে ইনছাফ প্রতিষ্ঠা হবে। সোনালী আলোর আলোয় উদ্ভাসিত হবে মানবমন। সেদিন বেশি দূরে নয় ইন-শাআল্লাহ দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ঐ স্বার্থান্বেষী মহল থেকে মুক্ত হয়ে আবার সকলে স্বাধীন হবে চিন্তার, বুদ্ধির জগতেও। গোলামের দাসত্ব ছিন্ন হয়ে তাওহীদের শিক্ষায় বলিয়ান হয়ে ইসলাম শিক্ষাই হবে বাংলাদেশের মানুষের জাতীয় জীবনের উন্নতির সোপান ইন-শাআল্লাহ!

শৈশবের ভারী ব্যাগ

আব্দুল্লাহ আল নুমান *

আজও স্কুল থেকে ফিরেই যেন ক্লান্তিতে নুয়ে পড়ল ছোট্ট ফারাবি। তার আট বছরের ছোট্ট কাঁধে বইয়ের ব্যাগটা আজ আরও ভারি মনে হচ্ছিল। সন্ধ্যা নামতেই যখন অন্য শিশুরা খেলাধুলায় মেতে ওঠে, তখন ফারাবিকে তার কোচিং ক্লাসের জন্য প্রস্তুত হতে হয়। কোচিংয়ে যেতে যেতে সে ভাবছিল, তার বন্ধুদের মতো তারও যদি বিকেলে খেলার সুযোগ থাকত, তাহলে হয়তো ভালো লাগত। কিন্তু তার অভিভাবকের একটাই কথা, "আর একটু কষ্ট করে পড়ো, ভালো ফল করলেই তো সবকিছু পাবে।"

ফারাবির এই গল্প শুধু তার একার নয়, এটি আমাদের দেশের হাজার হাজার শিশুর জীবনের প্রতিদিনের চিত্র। যেখানে শৈশবের নির্মল আনন্দ, ধর্মীয় শিক্ষা, আদব-আখলাক, খেলাধুলা আর মানসিক বিকাশের চেয়ে পড়াশোনার চাপই হয়ে উঠেছে প্রধান। আমাদের শিশুদের শৈশব কি তবে এক অদৃশ্য প্রতিযোগিতার নাম?

শিশুদের প্রতি আমাদের করণীয় কী হওয়া উচিত, তা ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হলো :

১. প্রথমেই শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া : শিশু যখন হাঁটতে শেখে তখন থেকেই তাকে সালাম দেওয়া, ধন্যবাদ বলা, বড়দের সম্মান করা, ছোটদের প্রতি দয়া প্রদর্শন শেখানো জরুরি। এ অভ্যাসগুলো তার অন্তরে দয়া, সহমর্মিতা ও পরস্পরের প্রতি সৌজন্য আচরণ গড়ে তুলবে।

ইসলামে শিষ্টাচার বা আদবকে ঈমানের অঙ্গ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। রাসূল ﷺ বলেন-

﴿إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ﴾

"আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দিতে।"[৮৭]

অন্য হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন- أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا-"ঈমানদারদের মধ্যে সবচেয়ে পূর্ণ সে-ই, যার চরিত্র সবচেয়ে উত্তম।"[৮৮]

অতএব, শৈশব থেকেই শিশুদের মধ্যে শিষ্টাচার শিক্ষা না দিলে ভবিষ্যতে জ্ঞান থাকলেও চরিত্রহীন হয়ে পড়বে।

২. নম্রতা ও ভদ্রতার চর্চা করানো : শিশুদের ছোটবেলা থেকেই কোমল ভাষায় কথা বলা, ঝগড়া-বিবাদ এড়িয়ে চলা, অহংকার থেকে দূরে থাকার শিক্ষা দিতে হবে। ভদ্রতা ও নম্রতা মানুষকে সমাজে গ্রহণযোগ্য ও ভালোবাসার যোগ্য করে তোলে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন- ﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ "মুমিনদের প্রতি তোমার ডানা ঝুঁলিয়ে দাও।"[৮৯]

রাসূল ﷺ শিশুদেরও এ শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেন-

«مَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّٰهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ» "যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য নম্র হয়, আল্লাহ তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন।"[৯০]

অতএব, নম্রতা শুধু সামাজিক সম্পর্কই উন্নত করে না, বরং আল্লাহর নিকট মর্যাদা বৃদ্ধি করে।

৩. ধর্মীয় জ্ঞান প্রদান : ছোট থেকেই আল্লাহর পরিচয়, নামাজ, দোয়া, হালাল-হারামের মৌলিক শিক্ষা দেওয়া অপরিহার্য। এতে তাদের ঈমান দৃঢ় হবে, অন্তরে তাকওয়া জন্মাবে এবং তারা হারাম থেকে বিরত থাকার অভ্যাস করবে।

রাসূল ﷺ বলেন-«مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ» "তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সাত বছর বয়সে নামাজ পড়ার আদেশ দাও।"[৯১]

ধর্মীয় জ্ঞান শিশুদের শুধু শিক্ষিতই করবে না বরং প্রকৃত মুমিন ও দায়িত্ববান মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে।

৪. মানবিক করে তোলা : শিশুদের শেখাতে হবে কিভাবে অভাবীদের সাহায্য করতে হয়, প্রাণীর প্রতি

শিক্ষার্থী- আল জামিয়াতুল ইসলামিয়্যাহ আস সালাফিয়্যাহ, জোরবাড়ীয়া কোনাপাড়া, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।

[৮৭] বর্ণনা করেছেন আবু হুরাইরা (রাঃ), সূত্র : আল-মুয়াত্তা (ইমাম মালিক, হা : ১৬১৪), মুসনাদ আহমাদ হা : ৮৯৫২।

[৮৮] বর্ণনা করেছেন আবু হুরাইরা (রাঃ), সূত্র : সুনান আত-তিরমিযী হা : ১১৬২, আবু দাউদ হাদীস হা : ৪৬৮২।

[৮৯] সূরা হিজর আয়াত : ৮৮।

[৯০] বর্ণনা করেছেন আবু হুরাইরা (রাঃ), সহীহ মুসলিম হা : ২৫৮৮।

[৯১] বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ), সূত্র : সুনান আবু দাউদ হা : ৪৯৫।

দয়া করতে হয়, সত্যবাদী হতে হয় এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন- ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ "তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য খাদ্য দেয় মিসকীনকে, ইয়াতীমকে এবং বন্দীকে।"[৯২]

রাসূল ﷺ বলেন-« الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ » "যারা দয়া প্রদর্শন করে, দয়াময় আল্লাহ তাদের প্রতি দয়া করেন।"[৯৩]

মানবিক শিক্ষা তাদের হৃদয় কোমল করবে, সমাজে শান্তি ও ন্যায়ের পরিবেশ গড়বে।

৫. পারিবারিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া : পরিবারই হলো শিশুর চরিত্র গঠনের প্রথম বিদ্যালয়। এখানে যদি ভিত্তি সঠিক হয় তবে ভবিষ্যতের শিক্ষা ও জীবন সঠিক পথে পরিচালিত হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবারকে আগুন থেকে রক্ষা কর।"[৯৪]

এ আয়াত স্পষ্ট প্রমাণ করে, অভিভাবকের প্রথম দায়িত্ব হলো সন্তানকে দ্বীনী শিক্ষা ও সঠিক চরিত্র প্রদান।

৬. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ধাপে ধাপে সূচনা : শিশুকে প্রথম থেকেই বইয়ের ভারী ব্যাগ দিয়ে চাপে ফেলা উচিত নয়। বরং ধাপে ধাপে বানান শেখানো, গল্প শোনানো, সুন্দর লেখা শেখানো ও মৌলিক পাঠে অভ্যস্ত করানো ধর্মীয় আদব আখলাক পারিবারিকভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত। পরিবার যেন শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয় এটাই কাম্য। অতঃপর ধাপে ধাপে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান দেখে শিশুর সুশিক্ষা নিশ্চিত করা অভিবাবক হিসেবে আমাদের একান্ত দায়িত্ব।

রাসূল ﷺ বলেন-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

অর্থ : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্বের ব্যাপারে জবাবদিহি করবে। ইমাম (শাসক) তার প্রজাদের জন্য দায়িত্বশীল এবং সে তার ব্যাপারে জবাবদিহি করবে। পুরুষ তার পরিবারের জন্য দায়িত্বশীল এবং সে তার ব্যাপারে জবাবদিহি করবে। নারী তার স্বামীর গৃহ ও সন্তানদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল এবং সে তার ব্যাপারে জবাবদিহি করবে। কোনো কর্মচারী তার মালিকের সম্পদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল এবং সে তার ব্যাপারে জবাবদিহি করবে।[৯৫]

অতএব তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্বের ব্যাপারে জবাবদিহি করবে।"

এই হাদীসটি মানবজীবনের প্রতিটি স্তরে দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহিতার শিক্ষা দেয়।

ইসলাম শুধু শাসক বা নেতা নয়, বরং প্রতিটি মানুষকেই তার অবস্থান অনুযায়ী দায়িত্বশীল মনে করে।

পিতা সন্তানের জন্য,

শিক্ষক ছাত্রের জন্য,

স্ত্রী স্বামীর গৃহের জন্য,

কর্মচারী কাজের ক্ষেত্রে-

সবাই কোনো না কোনোভাবে জবাবদিহির আওতায়।

তাই মুসলিম হিসেবে সন্তানের প্রতি দায়িত্বশীল আচরন করা ইমানের দাবি।

রাসূল ﷺ অপর হাদীসে বলেন : إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ "নিশ্চয়ই এই দ্বীন সহজ।"[৯৬]

---

[৯২] *সূরা দাহর আয়াত : ৮।*
[৯৩] *বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ), সূত্র : সুনান আত-তিরমিযী হা : ১৯২৪।*
[৯৪] *সূরা তাহরীম আয়াত : ৬।*
[৯৫] *সহীহ বুখারী হা : ৮৯৩।*
[৯৬] *বর্ণনা করেছেন আবু হুরাইরা (রাঃ), সূত্র : সহীহ বুখারি হা : ৩৯*

অতএব, শিক্ষা এমন হওয়া উচিত যা সহজ, আনন্দময় এবং শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশের সহায়ক হয়।

৭. শুধু ভালো ফল নয়, মানুষ তৈরি করাই লক্ষ্য হওয়া উচিত : আজকের সমাজে আমরা শিশুদের শুধু ভালো রেজাল্ট করতে শেখাই, কিন্তু নৈতিকতা শেখাতে ব্যর্থ হই। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃত মানুষ সেই, যার মধ্যে তাকওয়া, নৈতিকতা, শিষ্টাচার ও মানবিকতা বিদ্যমান।

আল্লাহ তা'আলা বলেন- ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ "নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত সে-ই, যে সর্বাধিক তাকওয়াবান।"[৯৭]

রাসূল ﷺ বলেন-

﴿إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ﴾

"আল্লাহ তোমাদের চেহারা ও ধন-সম্পদের দিকে তাকান না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমলের দিকে তাকান।"[৯৮]

তাই লক্ষ্য হওয়া উচিত শিশুদের মধ্যে মানুষ গড়ার মূল শিক্ষা প্রতিষ্ঠা করা।

☑ এভাবে ইসলামিক ভাবধারায় শিশুকে শিক্ষা ও চরিত্র গঠন করলে তারা হবে শুধু শিক্ষিত নয়, বরং প্রকৃত মুমিন, নৈতিকভাবে সুদৃঢ়, ভদ্র ও মানবিক মানুষ। কিন্তু আমরা শিশুদের ছোটকাল থেকেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতি এতটাই গুরুত্ব দেই যে, তাদের কোমল কাঁধে ভারী স্কুলব্যাগের বোঝা চাপিয়ে দেই। প্রতিদিন ক্লাসে প্রতিযোগিতার দৌড়ে নামিয়ে দেই, যেন শৈশব মানেই শুধু নম্বরের লড়াই। এই অযথা প্রতিযোগিতা ও চাপ তাদের স্বাভাবিক আনন্দ, খেলা-ধুলা ও মানসিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। ফলে শিশুরা পড়াশোনাকে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম হিসেবে না দেখে, একে কেবল বোঝা হিসেবে অনুভব করতে শুরু করে।

এর মাধ্যমে শিশুরা যে সমস্ত ক্ষতির সম্মুখীন হয় তা ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হলো :

<u>১. মানসিক ও শারীরিক চাপ :</u> শিশুদের ওপর অতিরিক্ত পড়াশোনার চাপ তাদের মানসিক অবসাদ, হতাশা এবং উদ্বেগের কারণ হয়। খেলাধুলা বা পর্যাপ্ত ঘুমের অভাবে তাদের শারীরিক বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয় এবং নানা রকম স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয়।

<u>২. সৃজনশীলতা ও কৌতূহল হ্রাস :</u> শুধু মুখস্থ বিদ্যা এবং পরীক্ষার ফলাফলের ওপর জোর দেওয়ার কারণে শিশুদের মধ্যে নতুন কিছু শেখার আগ্রহ কমে যায়। তাদের সৃজনশীলতা এবং নিজস্ব চিন্তাভাবনার ক্ষমতা হ্রাস পায়।

<u>৩. সামাজিক দক্ষতার অভাব :</u> অতিরিক্ত পড়াশোনার চাপে শিশুরা বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাতে পারে না। এর ফলে তাদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করার এবং দলগতভাবে কাজ করার দক্ষতা কমে যায়, যা ভবিষ্যতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

<u>৪. নিদ্রাহীনতা এবং মেজাজ খিটখিটে হওয়া :</u> দীর্ঘ সময় ধরে পড়াশোনা করার কারণে অনেক শিশু পর্যাপ্ত ঘুম পায় না। ঘুমের অভাবে তাদের মেজাজ খিটখিটে হয় এবং পড়াশোনার প্রতি মনোযোগও কমে যায়।

<u>৫. অতিরিক্ত চাপের কারণে পড়াশোনাকে বোঝা মনে করা :</u> শিশুরা সারাদিন পড়াশোনার অতিরিক্ত চাপের মুখে থেকে যখন সামান্য অবসর পায়, তখন তারা যেন লাগামহীন দুষ্টামিতে মেতে ওঠে। কারণ, সারাক্ষণ চাপের মধ্যে থাকার ফলে পড়াশোনা তাদের কাছে আনন্দ নয়, বরং এক বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। এতে তারা নিজ ইচ্ছায় খুব কম পড়তে চায়, পড়াশোনা মানে যেন শাস্তি বা বাধ্যবাধকতা। অথচ পড়াশোনা হওয়া উচিত আনন্দের বিষয়, জ্ঞান অন্বেষণের এক স্বতঃস্ফূর্ত যাত্রা। তাই শিশুদের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি না করে, তাদের জন্য পড়াশোনাকে আনন্দময় ও স্বতঃস্ফূর্ত করে তোলা আমাদের দায়িত্ব।

☑ <u>উপসংহার :</u> সন্তান আমাদের অমূল্য আমানত। যদি আমরা তাদের শৈশবকে জ্ঞান ও চরিত্রের সঠিক আলোকে গড়ে তুলতে পারি, তবে তারাই হবে আগামী দিনের সৎ, নৈতিক ও মানবিক নেতৃত্ব। আর যদি আমরা তাদের কেবল ভারী ব্যাগ ও নম্বরের প্রতিযোগিতায় বন্দি করি, তবে আমরা আসলে তাদের স্বপ্ন, আনন্দ ও ভবিষ্যৎ দুটোই ধ্বংস করব।❑❑

---

[৯৭] *সূরা হুজুরাত আয়াত : ১৩।*
[৯৮] *বর্ণনা করেছেন আবু হুরাইরা (রাঃ), সূত্র : সহীহ মুসলিম হা : ২৫৬৪*

বন্ধুত্ব

সাব্বির আহমেদ বিন সাইফুল ইসলাম ❄

❖ প্রিয়। শুনছো! তোমাকেই বলছি। তুমি কি জানো বন্ধুত্ব কী? যদি জেনেও থাকো তারপরেও আমার পক্ষ থেকে তোমার জন্য উপঢৌকন হিসেবে কিছু কথা লিখতে বসেছি। তাহলে শোন- আমার ক্ষুদ্র মেধার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামান্য কিছু অতি নগন্য কথা।

❖ বন্ধুত্ব শব্দটি সত্যিই অনেক স্পর্শকাতর। বন্ধুত্ব হচ্ছে জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। বন্ধু প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই এক অনাবিল হাসি-খুশি, আনন্দ আর অফুরন্ত উল্লাসের সোপান এবং দুঃখ-কষ্ট-বেদনা ভাগাভাগি করে নেওয়ার একটি মানযিল। জীবনে চলার পথে হয়তোবা মনের অজান্তে গড়ে ওঠে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব। যে বন্ধুত্ব সর্বদা দ্বীনের দিকে ধাবিত করে। সময়ের প্রয়োজনে জীবনের বাস্তবতায় আবার তার বিচ্ছেদ ও ঘটে। প্রয়োজনের তাগিদে অনেক দূরে চলে গেলেও যেন মুছে না ফেলি স্মৃতির পাতা থেকে কেউ কাউকে। এজন্যই কবির ভাষায় বলতে হয়-

বিদায় মানে নয় তো ইতি
বিদায়ে থাকুক একটু স্মৃতি।

এবং কবি বলেছেন :

"কত নিষ্ঠুর, কত নির্মম বিদায় দৃশ্য
তারি কারণে ধরণীর কাঁদে প্রাণ বিশ্ব"

আবার একজন বন্ধুই ইসলামের সুশীতল ছায়া থেকে পথভ্রষ্ট করার জন্য যথেষ্ট, এজন্য একজন ভালো বন্ধু না থাকলে নিঃসঙ্গ থাকাই ভালো। কারণ একজন উত্তম বন্ধু তার অপর বন্ধুকে সঠিক পথে চলতে সহায়তা করে।

অপরদিকে একজন অসৎ বন্ধু তার অপর বন্ধুকে বিপৎগামী এবং পথভ্রষ্ট করে, এমনকি বর্তমান যুবসমাজের দ্বীন ইসলাম থেকে বিমুখ হওয়া এবং তাদের চারিত্রিক অবক্ষয়ের এটি অন্যতম প্রধান কারণ। এ জন্যই রাসূল ﷺ বলেছেন :

❄ শিক্ষার্থী, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, ঢাকা।

«الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ»

"একজন মানুষ তার বন্ধুর আদর্শে বা রীতি-নীতিতে গড়ে ওঠে। অতএব তোমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত কার সাথে বন্ধুত্ব করবে।"[৯৯]

একজন খারাপ বন্ধু জাহান্নামে প্রবেশ করানোর জন্য যথেষ্ট। যেমনটি রাসূলের চাচার বেলায় ঘটেছিল। রাসূলের চাচা আবূ তালিবের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে নাবী কারীম ﷺ তার নিকট আগমন করেন। সেখানে আবু জাহালও ছিল। রাসূল ﷺ বললেন :

«أَيْ عَمِّ، قُلْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ»

অর্থ, চাচাজান! আপনি শুধু একবার লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ কালেমাটি পাঠ করুন। যাতে আমি বিচার দিবসে প্রমাণ হিসেবে তা আল্লাহর সমীপে পেশ করতে পারি।[১০০] তখন আবু জাহাল এবং আব্দুল্লাহ বিন উমাইয়া বলল : আবূ ত্বালিব আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম থেকে কি বিমুখ হয়েই যাবেন? এভাবে তারা উভয়েই অবিরাম তার সঙ্গে কথা বলতে থাকে। অবশেষে আবু ত্বালিব বাপ-দাদার ধর্মের ওপর অটল থাকলেন। অতঃপর উপায়হীন হয়ে বললেন :

«لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، مَا لَمْ أُنْهَ عَنْهُ» অর্থ, আমি যতক্ষণ বাধাপ্রাপ্ত না হবো ততক্ষণ আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবো[১০১]। এ প্রেক্ষিতে আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ করলেন :

﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾

"নারী এবং মুমিনদের জন্য শোভনীয় নয় মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, তারা নিকট আত্মীয় হলেও, যখন এটা তাদের কাছে সুস্পষ্ট যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী।"[১০২]

প্রিয় পাঠক : কখনো কখনো এই বন্ধুত্ব হতে পারে সফলতার সোপান। আবার কখনো কখনো বন্ধু নির্বাচনে ভুল করার কারণে এই বন্ধুত্ব হতে পারে চরম ব্যর্থতার কারণ।

[৯৯] আবূ দাউদ হা : ৪৮৩৩।
[১০০] সহীহ বুখারী হা : ৩৮৮৪।
[১০১] সহীহ বুখারী হা : ৩৮৮৪।
[১০২] সূরা আত-তাওবা আয়াত : ১১৩।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا (٢٧) يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا (٢٨) لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي﴾

অর্থ, জালিম ব্যক্তি সেদিন নিজের দুই হাত কামড়াতে কামড়াতে বলবে, হায়, আমার দুর্ভোগ, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। আমাকে তো সে বিভ্রান্ত করেছিল, আমার কাছে উপদেশ পৌঁছার পরও।[১০৩] এবং নাবী কারীম ﷺ উত্তম বন্ধু ও অসৎ বন্ধুর সম্পর্কে বলেছেন :

«مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالجَلِيسِ السَّوْءِ، كَمَثَلِ صَاحِبِ المِسْكِ وَكِيرِ الحَدَّادِ، لاَ يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ المِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيهِ، أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ، وَكِيرُ الحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ، أَوْ ثَوْبَكَ، أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً»

অর্থ, নাবী ﷺ বলেছেন : সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ হলো : আতরওয়ালা ও কামারের ন্যায়। আতরওয়ালা হয়তো তোমাকে কিছু দান করবে অথবা তার কাছ থেকে তুমি কিছু খরিদ করবে অথবা তার কাছ থেকে সুবাস লাভ করবে। আর কামার হয়তো তোমার কাপড় পুড়িয়ে ফেলবে অথবা তুমি তার কাছ থেকে দুর্গন্ধ পাবে।[১০৪]

প্রিয় পাঠক! আবার অনেকেই প্রশ্ন করে থাকেন যে, আমরা আমাদের বিয়ে, গায়ে হলুদ, আকীকা, জন্মদিন, রমজান মাসের ইফতারি অথবা অন্য যে কোনো অনুষ্ঠানে অমুসলিম বন্ধুদের দাওয়াত দিতে পারবো? অথবা তাদের কোনো অনুষ্ঠানে শরীক হতে পারবো? যারা এ ধরনের প্রশ্ন করে থাকেন তাদের এই প্রশ্ন করাটাই অনর্থক এবং ভিত্তিহীন। কারণ একজন অমুসলিম কখনো আপনার বন্ধু হতে পারে না। সে আপনার জন্য শয়তানের চাইতেও বেশি ক্ষতিকর। তাই তাদের ছলনাময়ী রসালো মিষ্টি কথায় এবং কাজে নিজেদের গা ভাসিয়ে দিলে চলবে না। কারণ তারা সর্বদা মুসলিমদের দুঃখ-কষ্ট, বিপদাপদ-অমঙ্গলে আনন্দিত হয়। যার জ্বলন্ত প্রমাণ ফিলিস্তিনবাসী। ইসরাইলী সেনাদের গুলিতে তাদের বুক ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে, অভাব-অনটন এবং খাদ্যের অভাবে প্রাণ যাচ্ছে শত শত শিশুর, তাদের বসতবাড়ি-ভবনগুলো সমূলে ধ্বংস করে দিচ্ছে এবং নিরীহ ফিলিস্তিনীদেরকে তাদের নিজস্ব ভূমি থেকে সমূলে উচ্ছেদ করার জন্য ইসরাইলকে বিভিন্ন অমুসলির দেশ অর্থনৈতিক এবং সামরিক সহায়তা করছে। এমনকি ফিলিস্তিনী মা-বোনদের গণধর্ষণের মাধ্যমে তাদের মান-মর্যাদাকে ধূলিসাৎ করে দিচ্ছে। এই অপকর্মগুলো কি আমাদের শিক্ষা দেয় না যে, অমুসলিমরা কখনো আমাদের বন্ধু হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ﴾

"হে মুমিনগণ! তোমরা ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না।"[১০৫] অন্যত্র বলেছেন :

﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ﴾

"মুমিনগণ যেন মুমিনকে ছাড়া কোনো কাফিরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। আর যারা এরূপ করবে আল্লাহর সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্কে থাকবে না।"[১০৬]

প্রিয় পাঠক : সৎ বা উত্তম বন্ধু গ্রহণ করলে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। যেমন : আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল রাসূল ﷺ-কে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করার ফলে। রাসূল ﷺ বলেছেন :

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً مِنْ أُمَّتِي خَلِيلاً لاتَّخَذْتُ أَبابَكرٍ خَلِيلاً

"আমি যদি আমার উম্মত হতে কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম, তাহলে অবশ্যই আবু বকরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম।" অনুরূপভাবে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এবং রাসূল ﷺ-এর সম্মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। রাসূল ﷺ বলেছেন :

فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا.

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমাকে তার খলীল বা বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। যেমন তিনি ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-কে খলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন।"[১০৭]

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য আমাদের দেশের যুবক-যুবতীরা সমধিকারের দোহাই দিয়ে হারাম পন্থায় একে-অপরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করছে। ঠিক এই জায়গাটায়

[১০৩] সূরা আল-ফুরকান আয়াত : ২৭-২৯।
[১০৪] সহীহ বুখারী হা : ২১০১, ৫৫৩৪।
[১০৫] সূরা মায়িদা আয়াত : ৫১।
[১০৬] সূরা আলে-ইমরান আয়াত : ২৮।
[১০৭] সহীহ বুখারী হা : ৪৩৫, সহীহ মুসলিম হা : ৫৩১।

আমাদের সরলমনা মা-বোনেরা সবচেয়ে বেশি ধোঁকা খায়। যুবকেরা তাদের আড়ালে যে সমস্ত কথা বলে তা যদি তারা শুনতো, তাহলে কখনো তারা পুরুষদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করতো না। বরং তারা বুঝতে পারতো যে, বোকার রাজ্যে তারা রানী হয়ে বসে আছে। একজন যুবক তাদের সাথে যে কথাই বলুক, যতই হাসুক, যত নরম কণ্ঠেই কথা বলুক ও যত কোমল আচরণই করুক না কেন, সেটি তার আসল চেহারা নয়, বরং সেটি তার অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মহা-ফাঁদ ব্যতীত অন্য কিছু নয়। আমাদের ডিজিটাল সমাজের মা-বোনেরা মানতেই চায় না যে, পুরুষেরা হচ্ছে নেকড়ে আর তারা হচ্ছে ভেড়া। তারা যদি এই কথা মানতো তাহলে নেকড়ের আক্রমণ থেকে ভেড়ার ন্যায় পলায়ন করতো। একজন যুবক অগণিত নারীর সতীত্ব ও পবিত্রতা নষ্ট করলেও যালেম সমাজ তাকে ক্ষমা করে দিবে। সমাজ বলবে : একটি যুবক পথহারা পথের পথিক ছিল, এখন সুপথে ফিরে এসেছে। কিন্তু একজন নারীকে কখনো ক্ষমা করবে না, বরং সে সর্বদা সমাজে অপমানিত, লাঞ্ছিত হতে থাকবে। এজন্যই আল্লাহ নারীর মান-মর্যাদা রক্ষার্থে বলেছেন :

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾

"তোমরা তোমাদের বাড়িতে অবস্থান করো আর পূর্ব জাহেলি যুগের লোকদের মতো সাজ-সজ্জা প্রকাশ করো না।"[১০৮] অন্যত্র বলেছেন :

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾

"তোমরা অশ্লীলতার কাছেও যেয়ো না। প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য।"[১০৯] এবং নাবী ﷺ বলেছেন :

«الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ»

"মহিলাদের সবটাই গোপনীয়। আর যখন সে বের হয় শয়তান তাকে পুরুষের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে তোলে।"[১১০]

প্রিয়! তুমি কী বিরক্তবোধ করছো? আর একটু ধৈর্য্যধারণ করো। লিখার ক্রান্তিলগ্নে কিভাবে তুমি তোমার উত্তম বন্ধুকে সনাক্ত করবে তার কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ্য করছি-

[১০৮] *সূরা আহযাব আয়াত : ৩৩।*
[১০৯] *সূরা আনআম আয়াত : ১৫১।*
[১১০] *তিরমিযী হা : ১১৭৩।*

১। সে সর্বদা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾

"তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল হওয়া উচিত, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎ কাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে।"[১১১]

২। ভালো কাজে সাহায্য করবে এবং পাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

"তোমরা পরস্পর সৎকর্ম, ও তাকওয়া অবলম্বনে সাহায্য করো এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে-অপরকে সাহায্য করো না।"[১১২]

৩। সর্বদা সত্য কথা বলবে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো।"[১১৩]

৪। মানুষের সাথে ধোঁকাবাজি করবে না। রাসূল ﷺ বলেছেন : «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»

"যে ব্যক্তি ধোঁকা দেয় যে আমাদের দলভুক্ত নয়।"[১১৪]

৫। সর্বদা বিপদাপদ এবং সকল প্রকার বালা-মসিবতে আল্লাহর ওপর ভরসা করবে এটা হতে পারে জান-মাল, অসুস্থতা, অভাব-অনটন বা অন্য কোনো বিপদাপদ। আল্লাহ বলেছেন : ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ অর্থ, যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করবে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট।[১১৫] অন্যত্র বলেছেন :

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ﴾

[১১১] *সূরা আলে-ইমরান আয়াত : ১০৪।*
[১১২] *সূরা আল-মায়েদা আয়াত : ২।*
[১১৩] *সূরা আহযাব আয়াত : ৭০।*
[১১৪] *সহীহ মুসলিম হা : ৪৩।*
[১১৫] *সূরা ত্বালাক আয়াত : ৩।*

অর্থ, অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো ভয়, ক্ষুধা, মাল, ও জানের ক্ষতি এবং ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে।[১১৬]

(৬) সর্বদা গোপনে এবং প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করবে। আল্লাহ বলেছেন : ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾

"যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার জন্য পথ বের করে দিবেন।" অন্যত্র বলেছেন :

﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾

"তোমরা পাথেয় সঙ্গে নাও, নিশ্চয় সর্বোত্তম পাথেয় তাকওয়া। হে বিবেকবানগণ তোমরা আমাকেই ভয় করো।"[১১৭]

৭। তার মাঝে থাকবে ন্যায়পরায়ণতা। আল্লাহ বলেছেন : ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾-"তোমরা সুবিচার করো। এটাই তাকওয়ার অধিক নিকটতম।"[১১৮]

৮। সে পিতা-মাতাকে সম্মান করবে এবং এবং তাদের সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾

"তোমার রব বিধিবদ্ধ করেছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না। এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো।"[১১৯]

এবং নাবী ﷺ বলেছেন :

رِضَى الرَّبِّ فِي رِضَى الْوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ»

"পিতামাতার সন্তুষ্টির মাঝে আল্লাহর সন্তুষ্টি আর পিতামাতার অন্তুষ্টির মাঝে আল্লাহর অসন্তুষ্টি রয়েছে।"[১২০]

(৯) সে সর্বদা অপরকে বিপদে সাহায্য করবে এবং জুলুম করবে না।

রাসূল ﷺ বলেছেন :

وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

[১১৬] সূরা আল-বাকারা আয়াত : ১৫৫।
[১১৭] সূরা আল-বাকারা আয়াত : ১৯৭।
[১১৮] সূরা আল-মায়েদা আয়াত : ৮।
[১১৯] সূরা বনী ইসরাইল আয়াত : ২৩।
[১২০] তিরমিযী হা : ১৮৯৯।

"আল্লাহ বান্দার সাহায্যে ততক্ষণ থাকেন যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকেন।"

১০। অন্যায় কাজকে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবে।[১২১] রাসূল ﷺ বলেছেন :

«مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ»

"তোমাদের মধ্যে যে অন্যায় দেখবে, সে যেন তা তার হাত দ্বারা বাধা দেয়। যদি হাত দিয়ে বাধা না দিতে পারে, তবে যেন মুখ দিয়ে বাধা দেয়। আর যদি মুখ দিয়ে বাধা না দিতে পারে তবে, যেন অন্তর দিয়ে বাধা অর্থাৎ ঘৃণা করে এটিই দুর্বল ঈমানের পরিচয়।"[১২২]

১১। সকল বিপদাপদে ধৈর্য্যশীলতার পরিচয় দিবে, এটা মুমিনের অন্যতম গুণাবলী। পৃথিবীতে পরীক্ষাস্বরূপ বিভিন্ন দুঃখ-কষ্ট, বিপদাপদের সম্মুখীন হবে এটাই স্বাভাবিক। রাসূল ﷺ বলেছেন।

«الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ، وَجَنَّةُ الْكَافِرِ»

"দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা এবং কাফেরের জন্য জান্নাত।"[১২৩]

১২। সে সর্বদা ফরজ সলাত এবং অন্যান্য ফরজ ইবাদত যথাযথভাবে পালন করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾

"নিশ্চয় সালাত অশ্লীলতা ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর যিকির হলো সবচাইতে বড়।"[১২৪]

(১৩) সে সর্বদা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বিরত থাকবে।[১২৫]

অর্থ, কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদই সর্বোত্তম জিহাদ। أفضل الجهاد جهاد الهوى এবং মালেক বিন দ্বীনার (রহঃ) বলেছেন :

[১২১] সহীহ মুসলিম হা : ৭০২৮।
[১২২] সহীহ মুসলিম হা : ৪৯।
[১২৩] সহীহ মুসলিম হা : ১৯৫৫।
[১২৪] সূরা আনকাবূত আয়াত : ৪।
[১২৫] ইবন মুফলিহ আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ ৩/২৫১।

من تباعد من زهرة الحياة الدنيا فذلك الغالب الهواء

"যে দুনিয়ার জীবনের চাকচিক্য ও আড়ম্বর থেকে দূরে থাকবে সেই তার কামনা-বাসনাকে পরাস্তকারী হবে।"[১২৬]

১৪। সে অহংকারী হবে না এবং তার চলা-ফেরা হবে নম্র-ভদ্র।

আল্লাহ বলেছেন :

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

"তুমি গর্ব করে পৃথিবীতে বিচরণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা দাম্ভিক, অহংকারীকে পছন্দ করেন না।"

১৫। সে শিক্ষক ছাত্র, পিতামাতা, বন্ধুবান্ধর এবং বাড়ির (দারোয়ান) থেকে শুরু করে সকল শ্রেণীর মুসলিমকে সালাম দিবে। রাসূল ﷺ বলেছেন :

«يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الكَبِيرِ، وَالمَارُّ عَلَى القَاعِدِ، وَالقَلِيلُ عَلَى الكَثِيرِ»

"ছোট-বড়কে, গমনকারী ব্যক্তি বসে থাকা ব্যক্তিকে ও কম সংখ্যক মানুষ বেশি সংখ্যক মানুষকে সালাম দিবে।"[১২৭] অন্যত্র রাসূল ﷺ বলেছেন :

«يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ»

"আরোহী ব্যক্তি পথচারীকে, পথচারী ব্যক্তি বসে থাকা ব্যক্তি এবং অল্প সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যককে সালাম দিবে।"[১২৮]

(১৬) সদা নিজের দৃষ্টিকে অবনমিত রাখবে এবং লজ্জাস্থানকে হেফাযতে, রাখবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ﴾

"তুমি মুমিনদেরকে বলো : তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনতার হিফাযত করে।"[১২৯] এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো : লজ্জাস্থান হেফাযত করার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা দৃষ্টির সংরক্ষণের কথা বলেছেন : কারণ মানুষ অধিকাংশ পাপকাজ করে থাকে দৃষ্টির মাধ্যমে।

যেমনটি কবি বলেছেন : كل الحوادث بيدأها من النظر "সমস্ত দুর্ঘটনার সূত্রপাত হয় দৃষ্টি দেওয়া থেকেই।"

এবং রাসূল ﷺ বলেছেন : كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ-প্রত্যেক চোখ ব্যাভিচারিণী।[১৩০]

১৭। যে সর্বদা পাশ্চাত্য সভ্যতার পঁচা-গলা অপসংস্কৃতি থেকে বেঁচে থাকবে।

রাসূল ﷺ বলেছেন : «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» "যে ব্যক্তি কোনো জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদের দলভুক্ত গণ্য হবে।"[১৩১]

১৮। সে অপরের দোষ-ত্রুটি মানুষের কাছে বলবে না বরং সেটা গোপন রাখবে।

রাসূল ﷺ বলেছেন : مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ "যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের ভুল-ত্রুটি গোপন রাখবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার ভুল-ভ্রান্তি গোপন রাখবেন।"[১৩২]

১৯। অনর্থক ও বাজে কথাবার্তা পরিত্যাগ করবে। রাসূল ﷺ বলেছেন : مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ "মানুষের জন্য ইসলামের সৌন্দর্য হচ্ছে তার অনর্থক কথাবার্তা পরিহার করবে।"

২০। কোনো ভুল করলে আল্লাহর কাছে তাওবা করবে। আল্লাহ বলেছেন : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا﴾ "হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা করো বিশুদ্ধ তাওবা।"[১৩৩] রাসূল ﷺ বলেছেন :

يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم مائة مرة .

"হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা করো এবং তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। কেননা আমি দৈনিক শতবার তাওবা করি।"[১৩৪]

প্রিয়! পরিশেষে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করে এবং তুমি যেন উত্তম, বন্ধু খুঁজে পাও রবের কাছে এই প্রার্থনা করে ইতি টানছি আমার উপঢৌকনের।❑❑

[১২৬] *হিলয়াতুল আওলিয়া ২/৩৬৪।*
[১২৭] *সহীহ বুখারী হা : ৬২৩১/৬২৩৪।*
[১২৮] *সহীহ মুসলিম হা : ২১৬০।*
[১২৯] *সূরা-আন-নূর আয়াত : ৩।*
[১৩০] *তিরমিযী হা : ২৭৮৬।*
[১৩১] *আবূ দাউদ হা : ৪০৩১।*
[১৩২] *সহীহ বুখারী হা : ২৪৪২।*
[১৩৩] *সূরা তাহরীম আয়াত : ৮।*
[১৩৪] *সহীহ মুসলিম ৪১/২৭০২।*

সূচিপত্র

"জ্ঞান : ধনের উর্ধ্বে অমর মহিমা"

মোঃ সুলাইমান বিন হাবিবুল্লাহ *

(পূর্ব প্রকাশের পরে)

৩৩. জ্ঞান মানুষের হৃদয়ে ভালোবাসার বীজ বপন করে, আর ধনসম্পদ জাগিয়ে তোলে হিংসা ও বিদ্বেষের আগুন। কবি বলেন :

ازْدَدْ عِلْمًا تَزْدَدْ قِيمَةً بَيْنَ النَّاسِ،

وَازْدَدْ مَالًا تَزْدَدْ حَسَدًا بَيْنَهُمْ.

"জ্ঞান বাড়াও - মানুষের চোখে তোমার মর্যাদা বাড়বে; ধন বাড়াও - মানুষের হৃদয়ে তোমার প্রতি হিংসা বাড়বে।"

৩৪. জ্ঞান ন্যায়ের দরজা খুলে দেয়, আর ধন প্রায়ই অন্যায়ের পথ দেখায়।

– قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه –

"تعلَّموا العلم قبل أن تُسَوَّدوا، فإن في العلم عدلاً."

"নেতৃত্ব পাওয়ার আগে জ্ঞান অর্জন করো; কারণ জ্ঞানে আছে ন্যায়বিচার ।"

৩৫. জ্ঞান হলো হৃদয়ের আরোগ্য, আর ধন-সম্পদ প্রায়ই সেই হৃদয়ের রোগ ডেকে আনে।

হাসান আল বসরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন :

"العِلْمُ دَوَاءُ القَلْبِ، وَالْمَالُ دَاءُهُ، فَاحْذَرِ الدَّاءَ وَخُذِ الدَّوَاءَ.

"জ্ঞান হৃদয়ের ওষুধ, আর ধন তার রোগ।"

সুতরাং রোগ থেকে বাঁচো, আর ওষুধ গ্রহণ করো।"

৩৬. জ্ঞান সব জায়গায় প্রিয় - আসমানে ও পৃথিবীতে; ধনসম্পদ শুধু পৃথিবীতে প্রিয়।

তাইতো আরবি প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে ;

العِلْمُ يُحِبُّهُ اللهُ وَالنَّاسُ، وَالمِالُ يُحِبُّهُ النَّاسُ فَقَطْ.

"জ্ঞানকে ভালোবাসেন আল্লাহ ও মানুষ,

আর ধন-সম্পদকে কেবল মানুষ ভালোবাসে।"

৩৭. জ্ঞান বইয়ের পাতায় অমর হয়ে থাকে,

আর ধন হিসাব-নিকাশের মধ্যে শেষ হয়ে যায়।

জনৈক মনীষী বলেছেন :

اكتب العلم لتخلده، وادخر المال ليزول معك،

فما بقي للإنسان بعد الموت إلا ما علَّمه وتركه.

"জ্ঞান লিখে রাখো যেন তা অমর হয়ে থাকে, ধন সঞ্চয় করো কিন্তু তা মৃত্যুর সঙ্গে চলে যাবে; মৃত্যুর পর মানুষের কাছে যা থাকে, তা হলো সে যা শিখিয়েছে এবং যা রেখে গেছে।"

৩৮. জ্ঞান সকলের জন্য উপকার বয়ে আনে, আর ধনসম্পদ কেবল তার মালিককেই উপকার দেয়। তাইতো বলা হয়ে থাকে;

العِلْمُ يُنْفَعُ بِهِ القَرْيَةُ وَالأُمَّةُ، وَالمالُ يَنْفَعُ فِي يَدِ صاحِبِهِ.

"জ্ঞান গ্রাম ও জাতি উভয়কে উপকৃত করে, আর ধন কেবল তার মালিকের উপকারে আসে।"

৩৯. জ্ঞান মানুষকে প্রজ্ঞা শেখায়, আর ধন মানুষকে কৌশল ও চতুরতা শেখায়।

আরবি কবি বলেন :

"العِلْمُ زَادُ القَلْبِ وَالنُّفُوسِ،

وَالمالُ زَادُ الحِيلَةِ وَالْمَكْرِ."

"জ্ঞান হৃদয় ও আত্মার পাথেয়,

আর ধন কৌশল ও চতুরতার পাথেয়।"

৪০. জ্ঞান বেশি বা অল্প-সবসময় মূল্যবান, কিন্তু ধনসম্পদ বেশি হলে তবেই তা শক্তিশালী।

৪১. জ্ঞান অন্তদৃষ্টির আলো বৃদ্ধি করে, আর ধন-সম্পদ প্রায়শই সেই আলো নিভিয়ে দেয়।

* শিক্ষার্থী, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, ঢাকা।

৪২. জ্ঞান মানুষকে আত্মবিশ্বাসী করে, আর ধন-সম্পদ মানুষের জন্য ধোকার কারণ।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন :

" المال مضيعة للقلوب إذا أحب بلا اعتدال".

"বেপরোয়া ধনপ্রেম হৃদয়কে নষ্ট করে ফেলে।"

৪৪. জ্ঞান যার সীমানা অসীম, আর ধনসম্পদের সীমানা নির্ধারিত।

৪৫. জ্ঞানের বাহক দারিদ্র হলেও সে তাকে মর্যাদা দেয়, অপরপক্ষে জ্ঞানহীন ধনীকে তার সম্পদ শিক্ষার মর্যাদা দিতে পারে না।

আলি বিন আবি তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন :

"العلم يرفع صاحبه ولو كان فقيرًا، والجهل لا يرفع صاحبه ولو كان غنيًا".

"জ্ঞান তার মালিককে মর্যাদার আসনে সমাসীন করে যদিও সে দরিদ্র হয়, আর অজ্ঞতা তার মালিককে মর্যাদার আসনে তুলতে পারে না যদিও সে ধনী হয়।"

৪৬. জ্ঞান মুমিন বান্দার অস্ত্র, আর ধনসম্পদ উদ্ধত-স্বৈরাচারীর। কবি বলেন :

العِلْمُ سِلَاحُ المؤمنِ في الحربِ والحياةِ،

وَالمالُ سِلَاحُ الجاهلِ والمعتدي.

"জ্ঞান হলো মুমিনের অস্ত্র জীবন ও যুদ্ধে সাহায্যকারী, আর ধনসম্পদ হলো অজ্ঞ ও সীমালংঘনকারীর অস্ত্র।"

৪৭. ইলম সহজে নষ্ট হয় না, ধনসম্পদ সহজেই নষ্ট হয়ে যায়।

৪৮. জ্ঞান আমলের মাধ্যমে ফলবতী হয়, ধনসম্পদ বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে বৃদ্ধি হয়।

৪৯. জ্ঞান অর্জন করে কেউ কখনো ক্ষতির সম্মুখীন হয় না, অপরপক্ষে ধনসম্পদ ব্যক্তিকে প্রায়ই বিপদে ফেলে। তাইতো বলা হয়ে থাকে;

العلم لا يضر، والمال غالبًا يضرّ

"জ্ঞান কখনো ক্ষতি করে না, ধনসম্পদ অধিকাংশ সময় ক্ষতি করে।"

৫০. জ্ঞান মানুষকে সত্যিকারের প্রভাবশালী করে, আর ধন কেবল ভৌত প্রভাবই প্রদান করে।

আরবি কবি বলেন :

"من طلبَ العلمَ صارت له الهيبةُ

ومن ابتغى المالَ غالبًا فقد الهيبة"

যে জ্ঞানকে খুঁজে তা হয়ে যায় তার জন্য গাম্ভীর্যতার কারণ, আর যে ধনকে খুঁজে প্রায়ই সে গাম্ভীর্য হারায়।

৫১. জ্ঞানের ধর্মই হলো উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া, আর সম্পদের ধর্ম হ্রাস পাওয়া।

আরবি কবি বলেন :

"العِلمُ نُورٌ لا يَفنى ولا يَغيبُ

يَنمو كزهرةٍ تَسقيها القُلوب"،

"জ্ঞান এমন এক আলো, যা নিভে না কখনো, এটি হৃদয়ের সিক্ত ফুলের মতো ক্রমে বাড়ে।"

৫২জ্ঞান মানুষকে মহান লক্ষ্য ও উৎকর্ষে পৌঁছে দেয় তথা আখিরাত, আর ধনসম্পদ কেবল ক্ষণস্থায়ী ইচ্ছা পূরণ করে তথা দুনিয়া।

৫৩. জ্ঞান আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে, চরিত্রকে সুন্দর করে তোলে, অন্যদিকে ধনসম্পদ মানুষের লোভ বাড়ায় ও সুন্দর গুণ নষ্ট করে।

কবি কত চমৎকারই না বলেছেন :

"العِلمُ يُثمرُ في الفؤادِ قناعةً،

تُغني الفقيرَ وتَهدِي المُتْرَفَا.

والمالُ يُنْبِتُ في القلوبِ طَمَعًا،

يُذلُّ حُرًّا ويُغري المشرَفَا".

"জ্ঞান হৃদয়ে ফোটায় সন্তুষ্টির ফুল,

যা দরিদ্রকেও সমৃদ্ধ করে, ধনীকেও পথ দেখায়।

কিন্তু ধন হৃদয়ে জন্ম দেয় লোভের আগুন, যা স্বাধীন মানুষকেও করে বন্দী, আর সম্মানীকেও করে প্রলোভিত।”

৫৪. জ্ঞান তথা কোরআন-হাদীসের মাধ্যমেই স্রষ্টার সৃষ্টিকে প্রকৃতভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব। ধনসম্পদের দ্বারা যা আদৌ সম্ভব নয়।

৫৫. জ্ঞানের প্রয়োজন প্রতিটি মুহূর্তে, অপরপক্ষে ধন-সম্পদের প্রয়োজন যৎসামান্য ক্ষেত্রে। তাইতো ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন :

الناس يحتاج الى الطعام كل يوم مرة او مرتين،والناس يحتاج الى العلم في كل حين.

মানুষের দিনে একবার বা দুবার খাদ্যের প্রয়োজন হয়, আর জ্ঞানের প্রয়োজন হয় প্রতিটি মুহূর্তে।

৫৬. ধনসম্পদ তার মালিককে দাস বানিয়ে দেয়, যা জ্ঞান কখনোই করে না। তাইতো রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم.....

“ধনসম্পদের পূজারীরা ধ্বংস...”

৫৭. ধনসম্পদের প্রাচুর্য প্রায়শই তার মালিককে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়, অপরপক্ষে জ্ঞানের মুগ্ধতা ব্যক্তিকে নতুন জীবন দান করে। সেই সাথে এটা অন্যকে নতুন জীবনের দিশা দিতে সাহায্য করে।

৫৮. জাতির বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা সর্বদা সতর্ক থাকে, যারা ধনের প্রতি লোভী, যে ধন তারা যত্নসহকারে রাখে এবং কমে গেলে তা নিয়ে চিন্তিত হয় সেই সমস্ত মানুষের প্রতি। অপরদিকে দেশে বা সমাজের জ্ঞানীদের এতটা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয় না। কেননা জ্ঞানই হলো নিরাপত্তা।

৫৯. জ্ঞান মানুষদের হৃদয় একত্রিত করে, আর ধন প্রায়ই তাদের বিভক্ত করে।

৬০. জ্ঞান হলো আলোর ওপর আলো,

ধন হলো হৃদয়ের অন্ধকার।

৬১. জ্ঞান ইবাদতকে সহজ করে, আর ধন তা জটিল করে তুলতে পারে।

৬২. জ্ঞান প্রকৃত রিজিকের দরজা খুলে দেয়, আর ধন সেই দরজা খুলে দিতে পারে না।

৬৩. জ্ঞান দ্বীনকে শক্তিশালী করে, আর ধনসম্পদ তা দুর্বল করে দিতে পারে।

৬৫. জ্ঞান হলো মহিমার ভিত্তি, আর ধন হলো অহংকারের ভিত্তি।

৬৬. জ্ঞান হলো কল্যাণের পথপ্রদর্শক, আর ধন হলো মোহ ও ইচ্ছার পথপ্রদর্শক।

৬৭. জ্ঞান মানসিক শক্তির কারণ, আর ধন দৈহিক বা বস্তুগত শক্তির।

৬৮. ব্যক্তির মাঝে জ্ঞান এবং ধনসম্পদের সমন্বয় ঘটলে তা হয় আলোর ওপরে আলো। অপরপক্ষে ব্যক্তির মাঝে শুধু ধনসম্পদের অর্জন অপরিপূরক।

৬৯. ধনসম্পদ রাজাধিরাজ, মন্ত্রীদের হাতের মন্ত্র; অপরপক্ষে জ্ঞান নবী-রাসূল ও মুমিনদের সম্পদ।

৭০. জ্ঞানের মর্যাদা সবার উর্ধ্বে অমর অমরত্ব। এ কথাই চিরধার্য,,, তাইতো আল্লাহ তা'আলা আদম (আলাইহিস সালাম) কে সকল ফেরেশতাদের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলেন কেবল জ্ঞানের কারণে।

পরিশেষে বলতেই হয়, জ্ঞান হলো মানুষের অমর মহিমা, যা সময় ও স্থানের সীমানা অতিক্রম করে। ধন যদিও চোখকে আকর্ষণ করে, মনকে প্রলুব্ধ করে এবং সাময়িক আনন্দ দেয়, তা কখনো হৃদয়কে আলোকিত করতে পারে না। কিন্তু জ্ঞান হৃদয়কে দীপ্তিময় করে, মনকে মুক্তি দেয় এবং সমাজে স্থায়ী মর্যাদা ও সম্মান বয়ে আনে।

সত্যিকারের মানুষ সেই, যিনি জ্ঞানকে নিজের ধন বানায়, কারণ এটি নষ্ট হয় না, কমে যায় না, হারায় না। ধন চলে যায়, সময় ও দুর্যোগ হারায়, কিন্তু জ্ঞান মানুষের চিরন্তন আলোকময় গৌরব, যা তাকে সত্যিকারের মর্যাদা, প্রজ্ঞা এবং কল্যাণের পথে পরিচালিত করে। আল্লাহর কাছে দোয়া করি রব আপনি আমাদের উপকারী জ্ঞান দান করুন! ❑❑

ফাতাওয়া ও মাসায়েল | الفتاوى والمسائل

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

প্রশ্ন (১) *আমি একজন মুসলিম নারী। আমাকে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত পড়তে হয়। আমাদেরকে মহিলা হিসেবে বাসাতে সলাত পড়তে হয়। অনেক সময় আমি বাসায় একা থাকি, আমি দরজা বন্ধ করে বাসার ভেতরে ফরজ সলাত পড়ি। এমন সময় দরজায় নক করার শব্দ শুনি এবং আমি বুঝি যে, আমার হাজব্যান্ড এসেছে। এমতাবস্থায় সলাত ছেড়ে দিয়ে আমি তার জন্য দরজা খুলতে যাই। এটা করা কি আমার জন্য বৈধ?*

আমিনুল ইসলাম, গাছা, গাজীপুর।

উত্তর : যদি স্বামী স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে তাহলে ফরজ সলাত ছেড়ে দিয়ে স্বামীর জন্য দরজা খুলতে যাওয়া বৈধ হবে না। এমন অবস্থায় আপনি বরং বাম হাতের তালুর উপর ডান হাতের তালুর নিচ দিয়ে মেরে তালি বাজাবেন। এতে করে সে বুঝবে, আপনি সলাতে আছেন।[১] কিন্তু এমনটা মাঝে মধ্যে হলে, আপনি দরজার নিকটে সলাত পড়তে পারেন' যাতে দুই এক পা এগিয়ে বা পিছিয়ে দরজা খুলে দিতে পারেন। যেমনটি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আয়েশা রযিয়াল্লা-হু আন্হা-এর জন্য সলাতের মধ্যে খুলে দিয়েছিলেন।[২] তবে যদি স্বামী জরুরী অবস্থায় থাকে একের পর এক শব্দ করতেই থাকে, হতে পারে তার পেশাব পায়খানার প্রচন্ড চাপ আছে, বিলম্ব হলে সমস্যা হবে। তাহলে আপনি ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে সলাতে ছেড়ে দিয়ে দরজা খুলে দিবেন এবং পুনরায় সলাত পড়বেন।[৩]

প্রশ্ন (২) : *মুসলিম মেয়ের জন্য কি হিন্দু বা অন্য কোনো অমুসলিম ছেলের সাথে বিবাহ করা বৈধ। যদি করে তাহলে কি সে মুসলিম থাকবে? যেমন ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া ইমানদার ছিলেন। এখন তো অনেক মেয়ে হিন্দু ছেলের খপ্পরে পড়ে যাচ্ছে। বিষয়টি দলীল দিয়ে জানাবেন।*

হাসিবুল ইসলাম, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

উত্তর : কোনো মুসলিম নারীর জন্য কোনো অমুসলিম পুরুষের সাথে বিবাহ করা বৈধ নয়। আল্লাহ এটা হারাম করে দিয়েছেন। তিনি বলেন : "তোমরা মুশরিকদের সাথে তোমাদের মুমিনা মেয়েদেরকে বিবাহ দিয়োনা।"[৪] রঈসুল মুফাছ্ছিরীন ইমাম ইবনু জারীর আত তবারী অত্র আয়াতের তাফসীরে বলেন : "আল্লাহ মুমিনা নারীদের উপর সর্বপ্রকার মুশরিকদের সাথে বিবাহ করা হারাম করে দিয়েছেন।"[৫] আর আছিয়া ও ফেরাউনের বিষয়টি পূর্বের শরীআতের যা আমাদের শরীআতে বৈধ নয়। আমাদের শরীয়াতে কোনো কাফেরের স্ত্রী ঈমান আনলে তার জন্য কাফের স্বামীর অধীনে থাকা হালাল নয়। মহান আল্লাহ বলেন: "হে ইমানদারগণ যখন তোমাদের কাছে মুমিন নারীরা হিজরত করে আসে তখন তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা করো। আল্লাহ তাদের ইমান সম্পর্কে অধিক অবগত আছেন। যদি তোমরা জানতে পারো তারা মুমিনা তাহলে তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠাবে না। এরা ওদের জন্য হালাল নয় এবং ওরাও এদের জন্য হালাল নয়।"[৬] অতএব, কোনো মুসলিম নারী যদি কোনো অমুসলিম ছেলের সাথে বিবাহ করে ফেলে তাহলে সে বিবাহ বিশুদ্ধ হবে না এবং তাদের সম্পর্কটা হবে যেনা ব্যভিচারের সম্পর্ক। এজন্য তাকে উক্ত ছেলেকে ত্যাগ করতে হবে এবং পাপের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। আর যদি সে কাফেরেরে সাথে বিবাহ করাকে হালাল মনে করে তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। আল্লাহ অধিক ভালো জানেন।

---

[১] সহীহ মুসলিম হা : ৪২১, সহীহ বুখারী হা : ১২০৪।

[২] আবু দাউদ হা : ৯২২, তিরমিযী হা : ৬০১, নাসাঈ হা : ১২০৬। আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

[৩] মাজমূউ' ফাতাওয়া বিন বায, (২৯/৩৪৭)।

[৪] সূরা আল-বাকারা আয়াত : ২২১।

[৫] তাফসীরে তবারী, (৩/৭১৮)।

[৬] সূরা মুমতাহিনা আয়াত : ১০।

প্রশ্ন (৩) : *আমাদের গ্রামে একজনের স্ত্রী ফোনে অন্য একটি ছেলের সাথে কথা বলত। পরে তার স্বামী জানতে পারল যে, ছেলেটা তার কলেজের বন্ধু ছিল। সে তার স্ত্রীকে ছেলেটার সাথে কথা বলতে নিষেধ করে। কিন্তু তার স্ত্রী তার কথা অমান্য করে তারপরেও কথা বলত। পরে তার স্বামী তাকে বলে, আর যদি তুমি তার সাথে কথা বল, তাহলে তুমি তালাক হয়ে যাবে। এর পরেও তার স্ত্রী ছেলেটির সাথে কথা বলেছে। এখন কি তার স্ত্রী তালাক হয়ে গেছে?*

মুহা : আব্দুস সাত্তার, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ

উত্তর : যদি তার স্বামী তাকে ভয় দেখানোর জন্য বা তাকে কথা বলা থেকে নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে ঐভাবে বলে থাকে, তাহলে তার স্ত্রী তালাক হবে না। আর যদি আসলেই তালাকের উদ্দেশ্যেই তাকে উক্ত কথা বলে থাকে, তাহলে তালাক হয়ে যাবে।[৭] নবী ﷺ বলেছেন : মুসলিমরা তাদের শর্তের উপরে থাকবে।[৮] আলবানী সহীহ বলেছেন।]

প্রশ্ন (৪) : *ঋতুবতী নারী যদি কুরআন তেলাওয়াতের সময় সাজদার আয়াত পড়ে অথবা অযু না থাকা অবস্থায় যদি সাজদার আয়াত পড়ে, তাহলে কি তার জন্য সাজদা করা যায়েয হবে?*

মো : জাহের আলী, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : হ্যাঁ, তার জন্য সাজদা করা যায়েয হবে। কারন তেলাওয়াতে সাজদার জন্য অযু ওয়াজিব নয়। তেলাওয়াতে সাজদাহ এক প্রকার যিকির। তাই অপবিত্র অবস্থায় এই সাজদাহ করা যাবে। এটাই সঠিক মত। অতএব ঋতুবতী নারী কুরআন পড়ার সময় সাজদার আয়াত তেলাওয়াত করলে সে সাজদাহ দিতে পারবে। একইভাবে ওযুহীন অবস্থায় কুরআন পড়ার সময় সাজদার আয়াত পড়লে সাজদাহ দিতে পারবে।[৯]

---

[৭] *সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ, (৩/২৭৪)।*
[৮] *আবু দাউদ হা : ৩৪৯৫।*
[৯] *মাউসূআ বাযিআহ লিল মাসায়েল আন নিসাইয়্যাহ, (১/৩৮৭)।*

প্রশ্ন (৫) : *আমাদের সমাজে মুখে মুখে প্রচলিত আছে, যার পীর নেই তার পীর হলো শয়তান। অতএব, প্রত্যেককে পীরের হাতে বয়াত হতে হবে। আমার প্রশ্ন হলো- এটা কি কোনো হাদীস? আর পীরের হাতে বয়াত না করলে কি গুনাহ হবে?*

মশিউর রহমান, তিতাস, কুমিল্লা।

উত্তর : "যার পীর নেই তার পীর শয়তান" এটা হাদীস নয়, হতে পারে না; বরং এটা শয়তানের উক্তি। এর দ্বারা তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চায়। মনে রাখবেন, পীরের হাতে বয়াত না করলে গুনাহ হবে না বরং পীরের হাতে বয়াত করলে গুনাহ হবে। ইসলামে প্রচলিত পীর মুরিদীর কোনো অস্তিত্ব নেই। তবে আলেমদের সহচর্যে থাকতে হবে, তাদের থেকে ইলম অর্জন করতে হবে। এ বিষয়ে ইসলাম উৎসাহিত করেছে।

প্রশ্ন (৬) : *রুকু করার সময় সলাত আদায়কারীর চক্ষু কোথায় থাকবে এবং তাশাহ্হুদ পড়ার সময় চক্ষুকোথায় থাকবে?*

ইমরান মুন্সি, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।

উত্তর : রুকু অবস্থায় সলাত আদায়কারী সাজদার স্থানে তাকাবে ঠিক দাড়ানো অবস্থার ন্যায়। অর্থাৎ, তার চক্ষু সিজদার স্থানের নিবন্দ থাকবে, আর তাশাহ্হুদে সে তার তর্জনী আঙ্গুলের দিকে তাকাবে।

প্রশ্ন (৭) : *কোনো বালেগা মেয়েকে কি তার পিতা জোর পূর্বক এমন ছেলের সাথে বিবাহ দিতে পারবে যাকে সে পছন্দ করে না? আবার কোনো বালেগা মেয়ে যদি কোনো ঈমানদার ছেলেকে পছন্দ করে এবং তাকে বিবাহ করতে চায়, তাহলে পিতার জন্য তাকে সে বিবাহ থেকে বাধা দেওয়া বৈধ?*

মিজানুর রহমান, দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ

উত্তর : কোনো বালেগা মেয়েকে জোরপূর্বক তার পিতা বিবাহ দিতে পারবে না। এটা তার জন্য বৈধ নয়। নবী ﷺ বলেছেন : কুমারী থেকে অনুমতি না নিয়ে তাকে বিবাহ দেওয়া যাবে না।[১০] আবার মেয়ে

---

[১০] *সহীহ বুখারী হা : ৫১৩৬।*

যদি কোনো ইমানদার ছেলেকে পছন্দ করে এবং তাকে বিবাহ করতে চায়, তাহলে পিতার জন্য তাকে বাধা দেওয়া বৈধ নয় যদি ছেলে কুফু হয়।[১১]

প্রশ্ন (৮) : *আমাদের এলাকার কিছুলোক আহলে কুরআন হয়েছে, তারা বলে কুরআনে নাকি কবরের আযাবের কথা নেই। তাই কবরের আযাবের বিষয়টি নাকি সঠিক নয়। দয়া করে দলীল সহ জানাবেন।*

আতাউর রহমান, ফুলছড়ি, গাইবান্ধা

উত্তর : যারা ইসলামের বিধান শুধু কুরআন থেকে গ্রহণ করে কিন্তু হাদীস থেকে গ্রহণ করে না; বরং হাদীস অস্বীকার করে তারা বাতিল দল এবং তারা কাফের। সুতরাং কাফের কী বলল, না বলল সেটা নিয়ে কাল ক্ষেপন করা সমীচীন নয়। আর কুরআনে অবশ্যই কবরের আযাবের প্রমান রয়েছে।[১২] অনুরূপ আরো আয়াত রয়েছে এবং বহু হাদীস দ্বারা কবরের আযাব প্রমাণিত।

প্রশ্ন (৯) : *কবর স্থানে সলাত পড়া যাবে কি এবং কবর স্থানে বসে কুরআন তেলাওয়াত করা যাবে কি? কারণ কবর স্থানে অন্তর নরম থাকে।*

মজিফুল ইসলাম, কালিয়া, নড়াইল।

উত্তর : কবর স্থানে সলাত পড়া যাবে না এবং কুরআন তেলাওয়াত করা যাবে না। নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ ইহুদী খ্রিস্টানদেরকে লানত করুক, তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়েছিল।[১৩] তাছাড়া নবী ﷺ আরো বলেছেন : তোমরা তোমাদের ঘরকে কবর স্থান বানিয়ো না (অর্থাৎ কবরে যেমন সলাত ও কুরআন তেলাওয়াত হয় না, তেমনটা তোমাদের ঘরকে বানিয়ো না বরং সেখানে সলাত ও কুরআন পড়।) কেননা, যে বাড়িতে সূরা বাকারা পড়া হয় সে বাড়ি থেকে শয়তান পালিয়ে যায়।[১৪] নবী ﷺ আরো বলেন : "তোমরা তোমাদের বাড়িতে কিছু সলাত পড়িও, সেটাকে কবরের মত বানিয়ো না।"[১৫]

[১১] *সূরা আল-বাকারা আয়াত : ২৩২।*
[১২] *সূরা গাফির : আয়াত ৪৬, সূরা আনআম : আয়াত ৯৩।*
[১৩] *সহীত মুসলিম হা : ৫২৯।*
[১৪] *সহীহ মুসলিম হা : ৭৮০।*
[১৫] *সহীহ বুখারী হা : ১১৮৭, সহীহ মুসলিম হা : ৭৭৭।*

প্রশ্ন (১০) : *সলাতের মধ্যে শয়তান আমাকে অনেক ডিস্টার্ব করে। মন অন্যদিকে নিয়ে যায়। এর থেকে বাচার উপায় কী? শয়তানকে কি সলাতের মধ্যে লানত করতে পারব?*

নুর হুসাইন, বাঘারপাড়া, যশোর

উত্তর : এর থেকে বাচার উপায় হল, যখন এমন হবে, তখন আপনি তিনবার বলুন : "আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রজীম" এবং বাম দিকে তিনবার থুতু নিক্ষেপ করুন।[১৬] তবে যেন থুতু কারো গায়ে না লাগে। আর সলাতে শয়তানকে লানত করা বৈধ।[১৭]

গুরুত্বপূর্ণ দু'আ সমূহ

❖ মা-বাবার জন্য দু'আ :

﴿رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَٰلِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ﴾

উচ্চারণ : 'রাব্বানাগ ফিরলি ওয়ালি ওয়ালিদাইয়া, ওয়ালিল মু'মিনিনা ইয়াওমা ইয়াক্বুমুল হিসাব।'

অর্থ : 'হে আমাদের প্রতিপালক! কিয়ামত দিবসে আমাকে, আমার পিতা-মাতা ও সকল মুমিনকে ক্ষমা করুন।' *(সূরা ইবরাহিম, আয়াত : ৪১)*

অথবা ﴿رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾

উচ্চারণ : 'রাব্বির হামহুমা, কামা রাব্বায়ানি সাগিরা।'

অর্থ : 'হে আমার প্রতিপালক, তাদের উভয়ের প্রতি রহম করো; যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।' *(সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ২৪)*

❖ সুসন্তান লাভের দু'আ :

﴿رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ﴾

উচ্চারণ : 'রাব্বি হাবলি মিল্লাদুনকা যুররিয়্যাতান ত্বাইয়্যিবাহ, ইন্নাকা সামিউদ দুআ'

অর্থ : 'হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার পক্ষ থেকে আমাকে পূতপবিত্র সন্তান দান করো। নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা কবুলকারী।' *(সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ৩৮)*

[১৬] *সহীহ মুসলিম হা : ২২০৩।*
[১৭] *সহীহ মুসলিম হা : ৫৪২।*

সূচিপত্র

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর প্রকাশিত বইসমূহ

নং	বই-এর নাম	লেখকের নাম	হাদীয়া
১	কালেমা তাইয়েবা	আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী	২০/-
২	আহলে হাদীস পরিচিতি	”	৯০/-
৩	নবুওয়াতে মুহাম্মাদী	”	৭০/-
৪	সিয়ামে রামাযান	”	৬/-
৫	তারাবীহ	”	৩০/-
৬	ঈদে কুরবান	”	১২/-
৭	তিন তালাক প্রসঙ্গ	”	১৫/-
৮	ফিরকাবন্দী বনাম অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি	”	৫০/-
৯	মুরগী আগে জন্মেছে না ডিম	”	২৪/-
১০	বিশিষ্ট গবেষকদের কলমে, আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরাইশী (রাহ:)-এর জীবনি	আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী	১০০/-
১১	ধর্ম বিজ্ঞান প্রগতি	প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী	২০/-
১২	বুলুগুল মারাম	অনুবাদ : মাও. আব্দুর রহমান	১০০/-
১৩	কিতাবুল কাবায়ির	”	৭০/-
১৪	নূরুল ঈমান	মূল : মাও. আব্বাস আলী মুর্শিদাবাদী	১০০/-
১৫	ইসলামের আলোকে জীবন বিধান	মুহাম্মদ আবুল হোসেন	৭০/-
১৬	নবুওয়াতী যুগে ইসলাম প্রচারে নারীদের অবদান	প্রফেসর ড. সুলাইমান বিন হামাদ আল-আওদাহ	১০০/-
১৭	সহীহ আল্-কালিমুত্ তাইয়িব	শায়খ মুহাম্মদ নাসেরু-দ্-দীন আল্-আলবানী	৫০/-

বাৎসরিক ৩৬০/- (তিনশত ষাট টাকা) প্রদান করে মাসিক তর্জুমানুল হাদীস-এর গ্রাহক হোন!
কুরআন ও সহীহ হাদীস মোতাবেক আলোকিত জীবন গড়ুন!!

দৃষ্টি আকর্ষণ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, মাসিক তর্জুমানুল হাদীস এবং সাপ্তাহিক আরাফাত-এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, প্রতিটি বিভাগের জন্য নির্ধারিত ফি, দান-অনুদানসহ যাবতীয় লেনদেন নিম্নবর্ণিত সংশ্লিষ্ট **ব্যাংক একাউন্ট**-এ পৃথকভাবে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

“বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস” ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. নওয়াবপুর রোড শাখা সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর- ২৮৫৬ যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৫	**“মাসিক তর্জুমানুল হাদীস”** শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি. বংশাল শাখা সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০ যোগাযোগ ও বিকাশ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮
“বিকাশ নম্বর” **০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫** চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে **০১৯৩৩৩৫৫৯০৫ মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।**	**“সাপ্তাহিক আরাফাত”** ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. বংশাল শাখা সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর- ১৩৩৫৯ যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগে পৃথক পৃথক মোবাইল নম্বর প্রদত্ত হলো। লেনদেন-এর পর সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

The Monthly Tarjumanul Hadeeth Reg. DA. 142

الجامعة الإسلامية العالمية للعلوم والتقنية ببنغلاديش

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বাংলাদেশ

মেধাবৃত্তির সুবিধা

ভর্তি চলছে

Fall Semester 2025

সরকার এবং ইউজিসি অনুমোদিত

৫০% টিউশন ফি ছাড়

ব্যাচেলর'স প্রোগ্রামস

- B.A. in Al Quran and Islamic Studies (AQIS)
- B.Sc. in Computer Science and Engineering (CSE)
- B.Sc. in Electrical and Electronic Engineering (EEE)
- Bachelor of Business Administration (BBA)

মাস্টার্স প্রোগ্রামস

- M.A. in Al Quran and Islamic Studies (AQIS)
- Master of Business Administration (MBA)
  Master of Business Administration (MBA-Regular)
  Master of Business Administration (MBA-Executive)

বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ

- মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজস্ব ৯ একর জমির উপর স্থায়ী গ্রীন ক্যাম্পাস
- উচ্চতর গবেষণা এবং কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা
- আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণা
- দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা শিক্ষকমণ্ডলী
- ডেডিকেটেড ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটসহ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার ল্যাব
- আধুনিক মেশিনারিজ ও যন্ত্রপাতি সজ্জিত ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্যাম্পাস
- 'সাইলেন্ট স্টাডি' এবং 'গ্রুপ স্টাডি' সুবিধাসহ বিশাল লাইব্রেরি
- ২৪x৭ সিসিটিভি ক্যামেরা এবং নিরাপত্তা প্রহরী
- শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গঠনে ইনটেনসিভ কেয়ার এবং কাউন্সেলিং
- ২৪x৭ বিদ্যুৎ (নিজস্ব ৫০০ কেভিএ সাব-স্টেশন এবং জেনারেটর)
- বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীদের আবাসিক সুবিধা

01329-728375-78 info@iiustb.ac.bd /iiustb

স্থায়ী ক্যাম্পাস: বাইপাইল, আশুলিয়া, ঢাকা-১৩৪৯। (বাইপাইল বাস স্ট্যান্ড থেকে আধা কি.মি. উত্তরে, ঢাকা-ইপিজেড সংলগ্ন)

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর পক্ষে সভাপতি অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক কর্তৃক
৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা- ১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।